একক 1 ❑ প্রাণের উৎপত্তি ও তার বিভিন্নতা

গঠন

1.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

1.2 প্রাণের স্বরূপ

জীবনের বৈশিষ্ট্য

প্রাণের আধার - প্রাণী বা সজীব বস্তু

সমাজ ও একটি প্রাণীর মধ্যে সাদৃশ্য

জীবের সুংসংগঠিত সংগঠন

1.3 কোষ-প্রাণের একক ও তার রাসায়নিক সংগঠন

1.4 পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ

বিশেষ সৃজন

স্বতঃজনন

মহাপ্রলয় থেকে প্রাণের সৃষ্টি

অন্য গ্রহ থেকে পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার

প্রাণের রাসায়নিক উৎপত্তি

জটিল জৈব অণুর পূর্বসুরীদের উৎপত্তি

বিভিন্ন জটিল জৈব অণুর সৃষ্টি

জটিল জৈব অণু থেকে "সংগঠিত কোষ" বা

আদি প্রাণীর সৃষ্টি

1.5 জীবনের বিভিন্নতা

বিভিন্নতার মাঝে ঐক্য

ঐক্য নির্ধারণ হয় কিভাবে

বিভিন্ন প্রকার প্রাণী গোষ্ঠী

1.6 সারাংশ

1.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1.8 উত্তরমালা

1.1 প্রস্তাবনা

'প্রাণ'-একটা ছোট্ট কথা, কিন্তু তার ব্যাপ্তি বহুদূর। প্রাণ আছে বলে আমরা জীবিত আর তা না থাকলে আমরা মৃত হয়ে যাই। এই মহাবিশ্বের নানা রকম সৃষ্টির মধ্যে অন্যতম প্রধান সৃষ্টি হল প্রাণ বা জীবন। মানুষ বহুদিন থেকেই ভেবেছে যে এই পৃথিবীতে কখন, কোথায় এবং কিভাবে প্রাণ সৃষ্টি হল। এই পৃথিবীতে যে অসংখ্য প্রকারের উদ্ভিদ ও প্রাণী রয়েছে তারাই বা হল কিভাবে তাও চিন্তাশীল মানুষকে বহুদিন ধরে ভাবিয়ে তুলেছে। বিজ্ঞানের অনেক অগ্রগতি হয়েছে কিন্তু ত সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা আজ অবধি পরীক্ষাগারে প্রাণ বা জীবন সৃষ্টি করতে পারেন নি। মানুষ তার উন্নত প্রযুক্তি ও জ্ঞানের মাধ্যমে এই মহাবিশ্বের অন্য কোথাও প্রাণী আছে কিনা তা সন্ধান করছে। কিন্তু আজ অবধি পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব জানা যায়নি। বর্তমান সময়ে আমরা এইটুকু জানি যে, প্রাণ আর নতুন করে সৃষ্টি হয় না শুধুমাত্র এক সজীব বস্তু থেকে অন্য সজীব বস্তুতে প্রবাহিত হয় মাত্র।

প্রাণ সৃষ্টি হয়েছিল সেই কোন সুদূর অতীতে তার হদিস পেতে গেলে সম্ভবতই কিছুটা অনিশ্চয়তা ও অনুমান নির্ভর হতে হয়, যদিও বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে চেষ্টা করেছেন প্রাণ সৃষ্টি সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত ধারনা দেবার। এই ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা সবাই একমত পোষণ করেন না তবুও এই অধ্যায়ে সেই জটিল সৃষ্টি সম্বন্ধে কিছু ধারনা দিতে চেষ্টা করবো।

উদ্দেশ্য ঃ

এই এককটি পড়ার পরে আপনি

- একটি প্রাণীর অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য কি তা নির্দেশ করতে পারবেন।
- প্রাণের স্বরূপ কি সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদগুলি উপস্থাপনা করতে পারবেন.
- বিভিন্ন মতবাদগুলির যৌক্তিকতা বিচার করতে পারবেন।
- বিশেষ করে প্রাণের রাসায়নিক উৎপত্তি সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবেন।
- প্রাণের রাসায়নিক উৎপত্তির সপক্ষে বিভিন্ন পরীক্ষা ও নিরীক্ষা বিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন।
- প্রাণ সৃষ্টি হওয়ার পরে তার বৈচিত্র্য বা জৈব অভিব্যক্তি সম্পর্কে বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

1.2 প্রাণের স্বরূপ

আপনারা প্রত্যেকেই প্রাণীদের সাথে পরিচিত। যাদের প্রাণ আছে তাদেরকে আমরা প্রাণী বলি। তবে সাধারণ ভাবে আমরা প্রাণী তাদেরকেই বলি যারা একস্থান থেকে অন্য স্থানে নড়াচড়া করতে পারে এবং যাদের দেহে সবুজ কণা (ক্লোরোফিল) নেই। যাদের দেহে সবুজ কণা থাকে, সূর্যের আলোর সাহায্যে নিজের খাদ্য প্রস্তুত করে নিতে পারে তাদেরকে আমরা উদ্ভিদ বলি। একটা কথা কিন্তু মনে রাখতে হবে যে উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। প্রাণ থাকা সত্ত্বেও আমরা উদ্ভিদদের প্রাণী বলি না তার কারণ হল এই দুটো জীব গোষ্ঠীকে আলাদা করে বোঝানোর জন্য। তাই আমরা উদ্ভিদ ও প্রাণীকে একসঙ্গে আমরা বলি সজীব বস্তু। যে বৈশিষ্ট্য থাকলে পরে আমরা তাদের সজীব বলি সে বৈশিষ্ট্যকেই আমরা বলি জীবন বা প্রাণ।

আমরা জানি যে পদার্থকে আশ্রয় করে থাকে শক্তি। পদার্থ ও শক্তি পরস্পর গভীর সম্পর্কযুক্ত। তেমনি প্রাণী ও প্রাণ অথবা সজীব বস্তু ও জীবন অত্যন্ত নিবীড় সম্পর্কযুক্ত। প্রাণের অস্তিত্ব প্রাণী ছাড়া সম্ভব নয়। তাহলে ব্যাপারটা এই দাঁড়ালো যে-প্রাণী হল আধার আর প্রাণ হল সামর্থ।

1.2.1 জীবনের বৈশিষ্ট্য

কোন সজীব বস্তুকে আমরা নির্জীব বস্তু থেকে আলাদা করে বুঝতে পারি তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের জন্য। এই সব বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়-এর ফল হল সজীবতা যা আমরা অনুভব করি প্রাণের স্পন্দন হিসাবে। সজীব বস্তুর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল -

(a) নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন -

(b) উত্তেজনা-অর্থাৎ বাইরের বা ভেতরের পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলে জীবদেহ উত্তেজিত হয় এবং অবস্থা অনুসারে সাড়া দেয়।

(c) চলন ও গমন

(d) বৃদ্ধি

(e) বিপাক-অর্থাৎ প্রত্যেক সজীব দেহে প্রতিনিয়ত নানা রাসায়নিক বিক্রিয়া চলে এদেরকে সামগ্রিক ভাবে বলা হল বিপাক।

(f) জনন-অর্থাৎ নিজের অনুরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অপত্য জীব সৃষ্টি করা।

(g) জরা ও মৃত্যু - অর্থাৎ অপত্য জীব সৃষ্টি হবার পরে তার একটি নির্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হয় তারপর পরিণতি প্রাপ্ত হয়, কর্মদক্ষতা কমে আসে, একে বলা হয় জরা। শেষে জীবটির সমাপ্তি ঘটে মৃত্যুতে।

(h) অভিযোজন ক্ষমতা-প্রত্যেক জীবের তার পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার এক অপূর্ব ক্ষমতা আছে। যে সব জীব পরিবেশের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেনি তারা বেশীরভাগ অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

(i) পরিবৃত্তিতা (Mutability) জীবদেহে বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক হল 'জীন' (gene) বা কোষের ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকে। এই জীনের মধ্যে হঠাৎ যে পরিবর্তন হয় তাকে পরিবৃত্তিতা বলে। এর ফলেই নতুন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটে ও ক্রমবিবর্তন সম্ভব হয়।

1.2.2 প্রাণের আধার - প্রাণী বা সজীব বস্তু

জীবনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটু আগে আপনি জানতে পেরেছেন। তার আগে এটাও জেনেছেন যে জীবন বা প্রাণ সবসময় কোন জীব বা প্রাণীরূপ আধারকে আশ্রয় করে থাকে। এবার দেখা যাক্ সেই আধার-এর প্রকৃতি কিরকম।

জীবনের যে বৈশিষ্ট্যগুলো বলা হল সেগুলো কিন্তু খাপছাড়া ভাবে প্রকাশ পায় না, তারা কিন্তু সুসংবদ্ধ (organised) এবং অন্যান্য পদার্থের মত বিভিন্ন রাসায়নিক মৌল (যেমন- কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফোরাস প্রভৃতি) দিয়েই গঠিত। অন্যান্য প্রাণহীন পদার্থের সাথে সজীব বস্তুর একটা মূল পার্থক্য হল - শক্তির ব্যবহার। শক্তি ছাড়া কোন কাজ করা সম্ভব নয়। নিষ্প্রাণ বস্তু শক্তির ব্যবহার নির্দিষ্ট ছন্দে করতে পারে না। কোন সজীব বস্তু যখন শক্তির ব্যবহার করতে অক্ষম হয় এবং যার ফলে জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ পায় না তখন তাকে অর্থাৎ সেই অবস্থাকে আমরা বলি - মৃত্যু। তাহলে সজীব বস্তুকে আমরা এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। সজীব বস্তু হল কিছু জটিল রাসায়নিক পদার্থের সুসংগঠিত সংগঠন যা পরিবেশ থেকে শক্তি আহরণ করে নিজের জৈবিক কাজে নির্দিষ্ট ছন্দে ব্যবহার করে।

প্রাণের স্বরূপ বুঝতে গেলে "জটিল রাসায়নিক পদার্থের সুসংগঠিত" - এই ব্যাপারটা বুঝতে হবে। আমাদের সমাজ থেকে একটু -উদাহরণ দিলে আপনাদের কাছে বিষয়টা স্পষ্ট হবে। আমাদের সমাজ অনেক ব্যক্তি দিয়ে গঠিত। ব্যক্তিদের আবার আলাদা আলাদা সামাজিক কর্তব্য পালন করতে হয়ে। যেমন - কেউবা কৃষিকাজে যুক্ত, চাষ-আবাদ করে ফসল উৎপাদন করাই তাদের প্রধান কাজ। আবার কেউবা রাজমিস্ত্রী, ঘরামী, কলু, জেলে, কর্মকার, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, ডাক-পিয়ন, পুলিশ, সৈন্য ইত্যাদি। এই সব বিভিন্ন পেশার মানুষেরা বিভিন্ন রকম সামাজিক কাজে ব্যস্ত। আমাদের সমাজে এই রকম নানা পেশার লোকেদের প্রয়োজন, কারণ কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে সমস্তরকম প্রয়োজনীয় পদার্থ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য আমরা চিকিৎসকের কাছে যাই। দেশের ভেতরের শান্তি বজায় রাখার জন্য রয়েছে আরক্ষা বাহিনী অর্থাৎ পুলিশ। আবার দেশের বাইরের শত্রুদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য আছে সৈন্যবাহিনী। এই রকম আরও অনেক পেশায় নিযুক্ত লোকেদের সুষ্ঠুভাবে কাজের ফলে আমাদের সমাজ চলছে ঠিকভাবে। এই বিভিন্ন পেশার লোকেদের কাজের মধ্যে একটা সমন্বয় দরকার। এই সমন্বয় এবং নিয়ন্ত্রণ-এর কাজ প্রধানতঃ করে থাকেন আমাদের সরকার (Government)।

1.2.3 সমাজ ও একটি প্রাণীর মধ্যে সাদৃশ্য

এতক্ষণ আপনি একটি সুসংবদ্ধ সমাজ বলতে কি বোঝায় তা জানলেন। এই যে বিভিন্ন পেশার লোকেরা সম্মিলিতভাবে গঠন করেছে আমাদের সমাজ তার একটি অনুরূপ চিত্র আমরা দেখতে পাই একটি প্রাণীর মধ্যে। আমাদের সমাজের একক যেমন একজন ব্যক্তি, তেমনি একটি বহুকোষী প্রাণীর একক হল এক একটি সজীব কোষ। সমাজে কয়েকজন একই পেশার ব্যক্তি মিলে যেমন একটি গোষ্ঠী তৈরী হয় (যেমন ধরা যাক কয়েকজন পুলিশ যারা রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করেন তারা সবই মিলে একটি গোষ্ঠী) তেমনি একটি দেহের অনেক একই রকম কোষ মিলে তৈরী হয় কলা (Tissue)। এই রকম কয়েকটি গোষ্ঠী মিলে আরও বৃহৎ গোষ্ঠী বা বিভাগ থাকে (যেমন যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ কাজের সঙ্গে যুক্ত পুলিশ কর্মীরা সকলে মিলে গঠন করে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ বিভাগ (Traffic Department) সেইরকম দেহের মধ্যে বিভিন্ন কলা কোষ একত্র হয়ে তৈরী করে দেহযন্ত্র (Organ)। সমাজে যেমন অনেকগুলো বিভাগের সমষ্টি হল একটি দপ্তর (যেমন- যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, চোর-গুণ্ডা দমন বিভাগ, গাড়ী বিভাগ, দাঙ্গা দমন বিভাগ প্রভৃতি মিলে গঠিত হয় পুলিশ দপ্তর বা স্বরাষ্ট্র দপ্তর (Home Ministry) । তেমনি দেহে অনেকগুলো দেহ যন্ত্র মিলে তৈরী হয় একটি দেহ তন্ত্র (Body System)। সমাজে এইরকম অনেক দপ্তর মিলে গঠিত হয় প্রশাসন বা সরকার (Adminsitration or Government), তেমনি অনেক দেহ তন্ত্র মিলে গঠিত হয় দেহ।

তাহলে আপনি জানতে পারলেন যে দেহ গঠিত হয় একাধিক দেহ তন্ত্র দিয়ে, দেহ তন্ত্র গঠিত হয় একাধিক দেহ যন্ত্র নিয়ে দেহ যন্ত্র গঠিত হয় একাধিক কলা দিয়ে আর কলা গঠিত হয় একাধিক কোষ দিয়ে। কোষই হল জীবের একক। পারস্পরিক সম্পর্কটা একটু বুঝিয়ে বললে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই রকম—

- অনেকগুলো পেশী কোষ দিয়ে তৈরী হয় পেশী কলা।
- অনেকরকম কলা, যেমন পেশী কলা, আবরণী কলা, ক্ষরণ কলা প্রভৃতি, মিলে গঠিত হয় পাকস্থলী। অর্থাৎ একটি দেহ যন্ত্র।
- অনেক রকম দেহযন্ত্র মিলে গঠিত হয় দেহতন্ত্র। যেমন মুখ, দাঁত, গ্রাসনালী, পাকস্থলী, অন্ত্র, লালাগ্রন্থি যকৃত, অগ্ন্যাশয় প্রভৃতি মিলে গঠিত হয় পরিপাক তন্ত্র।
- একাধিক তন্ত্র, যেমন পরিপাক তন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র, ত্বকতন্ত্র, সংবহন তন্ত্র, রেচন তন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র, জননতন্ত্র প্রভৃতি মিলে গঠিত হয় একটি সম্পূর্ণ প্রাণী দেহ।

বর্তমান আলোচনায় আপনি যা জানতে পারলেন তার থেকে আপনার ধারণা এইরকম হল যে- একটি সুস্থ দেহ মানে তার দেহের সব দেহতন্ত্রগুলো ঠিকমত কাজ করছে। দেহতন্ত্র ঠিক মত কাজ করবে যখন দেহযন্ত্রগুলো ঠিক মত কাজ করবে। দেহযন্ত্র ঠিক তখনই থাকবে যখন কলা এবং কলাকোষগুলো সঠিকভাবে কাজ করবে।

1.2.4 জীবের সুসংহত সংগঠন

জীবের সংগঠন সম্বন্ধে ধারণা এতক্ষণে আপনার কাছে নিশ্চয় স্পষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ জীব অসংখ্য সজীব কোষ দিয়ে তৈরী। এই অগুন্তি কোষ কিন্তু খামখেয়ালীভাবে কাজ করে না। দেহের সমস্ত কোষ-কলা-যন্ত্র / অঙ্গ-তন্ত্র সবাই কিন্তু একটি নির্দিষ্ট ছন্দে কাজ করে। যখন যে কাজ করা প্রয়োজন এবং যতটুকু কাজ করা প্রয়োজন ততটুকুই কাজ করে দেহের কোষ-কলা-অঙ্গ ও তন্ত্র। সুস্থ দেহে এই কাজ বেশীও হয় না আবার কমও হয় না। এই যে প্রয়োজনভিত্তিক কাজ করার ধরণ তা কিন্তু নিষ্প্রণ জগতে আমরা দেখতে পাই না। এইভাবে কাজ করার ফলে অপচয় প্রায় হয় না বললেই চলে। এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই লুকিয়ে আছে জীবনের ফল্গুধারা অর্থাৎ প্রাণের প্রকাশ।

এবার তাহলে এই বৈশিষ্ট্য একটু বুঝিয়ে বলা যাক্। আমি যখন বিশ্রামরত অবস্থায় আছি তখন হয়ত আমার শ্বাসক্রিয়ার গতি প্রতি মিনিটে আঠারো বার আর হৃদ্‌গতি প্রতি মিনিটে 72 বার। তারপর আমি একটু পরিশ্রম করলাম তখন দেখলাম যে আমার শ্বাসক্রিয়ার গতি হৃদ্‌গতি দুটোই বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপর আস্তে আস্তে দুটোই স্বাভাবিক অবস্থায় চলে এলো। এরকম কেন হল? এর কারণ হল বিশ্রামরত অবস্থায় শরীরের যতটুকু অক্সিজেন প্রয়োজন তা ঐ 18 বার শ্বাসক্রিয়া ও 72 বার হৃদ্‌স্পন্দন প্রতি মিনিটে হলেই মিটে যাচ্ছিল। পরিশ্রম করার ফলে অক্সিজেন-এর চাহিদা বেড়ে গেল আর সেই চাহিদা পূরণ করার জন্য চাহিদার সঙ্গে সমতা রেখে বেড়ে গেল শ্বাসক্রিয়া ও হৃদ্‌স্পন্দন। পরিশ্রম শেষ হবার পরে অক্সিজেন-এর চাহিদা কমতে থাকল, ফলে শ্বাসক্রিয়া ও হৃদস্পন্দন-এর হারও কমতে থাকল। অর্থাৎ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রয়োজনমতই ব্যবহৃত হয় এবং যখন যতটুকু দরকার তখন ততটুকুই কাজ করে। এর ফলে শক্তির অপচয় কমানো যায়।

অনুশীলনী-1

1. নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলির সত্য / মিথ্যা যাচাই করুন।

a) সজীব বস্তুর নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন থাকে না।

b) অভিযোজন ক্ষমতা জীবনের ধর্ম

c) প্রাণীদের অবলুপ্তির একটি প্রধান কারণ হল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারা।

d) জৈব জগৎ মূলতঃ সিলিকন ভিত্তিক।

2. শূন্যস্থান পূরণ করুন।

a) জীব জগতের অত্যাবশ্যক মৌলগুলো হল ————, হাইড্রোজেন, ————, নাইট্রোজেন ও ————।

b) প্রাণীরা সাধারণতঃ শক্তি এবং পদার্থের ———— করে না।

1.3 কোষ - প্রাণের একক ও তার রাসায়নিক সংগঠন

আগের অংশে বলা হয়েছে প্রাণের একক হল সজীব কোষ। একটি সজীব কোষের অন্তর্গঠন জানলে পরে প্রাণের উৎপত্তির ধারা সম্পর্কে ধারণা একটু স্পষ্ট হবে।

একটি সজীব কোষ সবসময় বাইরের পরিবেশ থেকে নিজেকে আলাদা করার জন্য একটা পাতলা আবরণী দিয়ে ঢেকে রাখে। এই বহিঃআবরণী কিন্তু শুধুমাত্র যান্ত্রিকভাবে কোষস্থ পদার্থগুলোকে ঘিরে রাখে না প্রয়োজনমত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থকে ভেতরে আসতে দেয় আবার কিছু পদার্থকে কোষের ভেতরথেকে বাইরে পাঠাতে সাহায্য করে। অর্থাৎ এই বহিঃআবরণী, যা কিনা প্রোটিন, স্নেহ জাতীয় পদার্থ ও কিছু শর্করা জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরী, তা কোষের বেঁচে থাকার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এই প্রকার বহিঃআবরণী ভিন্ন কোন কোষ সজীব থাকতে পারে না।

কোষের বহিঃআবরণীকে কোষ পর্দাও বলা হয়। এই কোষ পর্দা ঘিরে রাখে কোষের প্রোটোপ্লাজমকে। এই প্রোটোপ্লাজম-এর মধ্যে থাকে সাধারণতঃ একটা কেন্দ্র যা নিউক্লিয়াস এবং অবশিষ্ট অংশ সাইটোপ্লাজম। নিউক্লিয়াস হল নির্দেশদাতা। নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে নিউক্লিয় অম্ল (Nucleie Acid), সেই নিউক্লিয় অম্লের মধ্যে সংকেত আকারে নির্দেশ রাখা থাকে। এই নিউক্লিয় অম্ল শুধুমাত্র সেই কোষের কাজের নির্দেশ বহন করে তাই নয় সেই জীবের সমস্ত বৈশিষ্ট্য সহ তার অপত্য কোষগুলোর মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারণ শুধুমাত্র কোষ তেকে কোষে ঘটে তাই নয়, এই সঞ্চারণ এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মেও সঞ্চারিত হয়। সজীব বস্তুর এ এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যার কোন রকম জুড়ি নিষ্প্রাণ জগতে পাওয়া যায় না।

কোষের সাইটোপ্লাজমকে বলা যেতে পারে কোষের কারখানা। এখানে অনেক রকম কাজ হয়, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল প্রোটিন সংশ্লেষ। প্রোটিন হল সজীব দেহের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গঠনগত ও কার্যগত উপাদান। প্রোটিন ছাড়া প্রাণের অস্তিত্ব প্রায় ভাবাই যায় না। বিভিন্ন কাজের জন্য প্রোটিনের গঠন বিভিন্ন রকম। এই বিভিন্ন প্রকার প্রোটিন তৈরী করার জন্য নির্দেশ রাখা থাকে নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয় অম্লের মধ্যে। যখন যে ধরনের প্রোটিনের প্রয়োজন সেই মত নির্দ্দেশ নিউক্লিয়াস থেকে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অবস্থিত রাইবোজোম নামক অঙ্গাণুতে আসে এবং তারপর সেখানে প্রোটিনের সংশ্লেষ ঘটে এক জটিল পদ্ধতির মাধ্যমে।

এবার আপনি বুঝতে পারছেন যে প্রাণ সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে অন্যতম প্রধান জিজ্ঞাসা হল কিভাবে এই প্রোটিন, নিউক্লিয় অম্ল, স্নেহ পদার্থ প্রভৃতি জটিল অণুগুলো সৃষ্টি হল এবং পরস্পরের সঙ্গে এক সম্পর্কের মাধ্যমে সংযুক্ত হল। ঐ জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে মানুষ বহু যুগ যুগ ধরে ভেবে এসেছে।

এই ভাবনার অংশীদার হিসাবে যেমন আছেন বিজ্ঞানীরা তেমনি আছেন চিন্তাবিদ, দার্শনিক এমনকি ধর্মীয় নেতারা। এখন তাহলে আমরা সেই চিন্তারাশির উপর একটু আলোকপাত করি।

অনুশীলনী-2

1. সঠিক শব্দটি নীচের থেকে বেছে নিন

(a) প্রাণীদেহের একক হল ——।

(b) সজীব কোষের কেন্দ্র হল ——।

(c) প্রোটিন সংশ্লেষ হয় সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অবস্থিত —— নামক কোষ অঙ্গাণুতে।

(d) সজীব কোষের একটি অতি আবশ্যিক উপাদান হল ——।

[রাইবোজোম, কোষ পর্দা, কোষ, নিউক্লিয়াস]

1.4 পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ

এতক্ষণ যে আলোচনা হল তাতে আপনি জানতে পারলেন জীবনের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ কি। জীবনের রাসায়নিক সংগঠন সম্বন্ধেও একটু ধারণা হয়েছে। যে সকল জটিল জৈব অণু দিয়ে সজীব বস্তু সংগঠিত হয় তা কিন্তু অত্যন্ত সরল প্রকৃতির অণু বা সাধারণ মৌল, যেমন - কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস প্রভৃতি দিয়েই তৈরী। এখন প্রশ্ন হল আমাদের নিষ্প্রাণ পরিবেশেও এই সকল মৌল বা সরল অণু প্রচুর পরিমাণে রয়েছে তথাপি এখন আর (সম্ভবতঃ) নতুন করে প্রাণ সৃষ্টি হয় না। তাহলে প্রথমে প্রাণ সৃষ্টি হল কিভাবে? এই প্রশ্ন যুগে যুগে মানুষ ভেবে এসেছে। সেই ভাবনারাশিগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে এবার আলোচনা করা যাক।

1.4.1 বিশেষ-সৃজন মতবাদ (Theory of Special Creation)

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মীয় মতাবলম্বীর সাধারণ বিশ্বাস হল এই পৃথিবীতে বিভিন্ন সজীব বস্তু বহু বছর আগে এক ঐশ প্রত্যাদেশে সৃষ্ট হয়েছিল। এই সকল সজীব বস্তুর সৃষ্টিকর্তা হলেন ঈশ্বর এবং তাঁর ইচ্ছাতেই এই বিভিন্ন প্রকার জীব সৃষ্টি হয়েছে। এই ধারণা অনুযায়ী এই পৃথিবীতে প্রাণ প্রায় দশ হাজার বছর আগে হয়েছিল এবং তারপর কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়াই বর্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে।

এই মতবাদ প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা পোষণ করে না। জীবাশ্ম থেকে জানা গেছে যে প্রায় তিনশো কোটি বছরের আগেও পৃথিবীতে প্রাণী ছিল। শুধু তাই নয় এমন অনেক প্রকার জীব

ছিল যারা বর্তমানে বেঁচে নেই আবার বর্তমানের জীবের পূর্বপুরুষরা অন্যরকম ছিল। সুতরাং এই মতবাদ বাস্তব তথ্য-নির্ভর নয়।

1.4.2 স্বতঃ-জনন মতবাদ (Theory of Spontaneous Generation)

প্রাচীন গ্রীস দেশের চিন্তাবিদরা এই মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন। তারা দেখেছিলেন যে, মাটি, কাদা, পচা জিনিস, আবর্জনা প্রভৃতি স্থানে আপনা আপনি বিভিন্ন পোকা-মাকড় এর জন্ম হয়। তাই তাদের বিশ্বাস ছিল প্রাণ আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়। দার্শনিক ও চিন্তাবিদ অ্যারিস্টোটল (484 – 322 খ্রীঃ পূর্বাব্দ) এই ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। শুধু কীট-পতঙ্গ নয় এই রকম ভাবে অপেক্ষাকৃত উন্নত জীব, যেমন মাছ, ব্যাঙ এমনকি ইঁদুর, সৃষ্টি হতে পারে বলেই তাঁর বিশ্বাস ছিল। পরবর্তীকালে পুরো মধ্যযুগ ধরে এই ধারণা মানুষের মনে স্থান পেয়ে এসেছিল।

স্বতঃ-জনন মতবাদকে প্রথম ভ্রান্ত প্রমাণ করেন এক ইতালী দেশীয় চিকিৎসক ফ্রানসেস্‌কো রেডী (Francesco Redi) । সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি পরীক্ষাদ্বারা দেখালেন যে কোন কাঁচা মাংস-র উপর মাছি বসতে না দিলে সেখানে কীট অর্থাৎ ম্যাগট (Maggot হল মাছির জীবন চক্রের একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক দশা) সৃষ্টি হয় না। মাছি মাংসের উপর বসে তাতে ডিম পাড়ে আর তা থেকেই ওই কীটের জন্ম হয়। বিজ্ঞানী রেডীর পরীক্ষার পরে 1677 খ্রীষ্টাব্দে অ্যান্ত ভ্যান লিউয়েনহুক্ (Anton van Leeuwenhoek) অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র জীবদের উপস্থিতি দেখিয়ে দিলেন। এই ঘটনার পরে স্বতঃ-জনন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় না কিন্তু অতি ক্ষুদ্র, আণুবীক্ষণিক জীব স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সৃষ্টি হতে পারে।

এরপর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আর এক ইতালীয় বিজ্ঞানী ল্যাজারো স্পালান্‌জনি (Lazzaro Spallanzani) ও ইংরেজ বিজ্ঞানী জন নিডহাম (John Needham) দুজনেই প্রায় একই রকম পরীক্ষা করলেন কিন্তু ফল হল দুরকম। দুজনেই কিন্তু জৈব পদার্থ, যেমন মাংসের ঝোল, কাঁচের পাত্রে ভাল করে ফুটিয়ে পাত্রের মুখ ভাল করে বন্ধ করে রাখলেন। নিড্‌হাম পাত্রের মুক বন্ধ রাখলেন কর্ক দিয়ে। তারপর বেশ কিছুদিন পর দেখলেন যে ওই ঝোলের মধ্যে আণুবীক্ষণিক জীব সৃষ্টি হয়েছে। এ থেকে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীব স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে স্পালান্‌জনি কিছু পাত্রের মুখ গরম করে কাঁচ গলিয়ে বন্ধ করে দিলেন তারপর আরও ভাল করে ফুটিয়ে অনেকদিন পরেও দেখলেন যে ওই ঝোলের মধ্যে কোন ক্ষুদ্র জীব সৃষ্টি হয়নি। এই পরীক্ষা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে অতি ক্ষুদ্র জীব বাতাস মারফৎ বাহিত হয়ে জৈব পদার্থের উপর পড়ে তার বংশবৃদ্ধি ঘটে, তাদের স্বতঃজনন হয় না।

পরবর্তীকালে আরও অনেক বিজ্ঞানী স্পালান্‌জনি-র মত পরীক্ষা করেন কিন্তু তারা অতি ক্ষুদ্র জীবের

উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। ফলে স্বতঃজনন মতবাদ টিকে থাকল। আসলে এই সব পরীক্ষায় জীবাণুমুক্তকরণ (Sterilization) সঠিক ভাবে হয়নি ফলে অতি ক্ষুদ্রজীবের বংশবৃদ্ধি ঘটেছে।

স্বতঃ-জনন মতবাদ সর্বশেষ ধাক্কা খেল ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর-এর গবেষণায়। তিনি রাজহাঁসের মত গলা বিশিষ্ট কাঁচের পাত্রে (ফ্লাস্ক) চিনির দ্রবণ রেখে তাকে খুব ফুটিয়ে কিছুদিন রেখে দেখালেন যে পাত্রের তরলে কোন ক্ষুদ্র প্রাণীর সৃষ্টি হয়নি. অথচ যে পাত্রে লম্বা গলা ভাঙ্গা ছিল তার মধ্যে ক্ষুদ্র প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। রাজহাঁসের মত দীর্ঘ গলা পাত্রের মধ্যে জীবাণু প্রবেশে বাধা দিয়েছে তাই তার মধ্যে জীবের সৃষ্টি হয়নি। (চিত্র 1.1)। বিশিষ্ট জনের সামনে পাস্তুরের এই পরীক্ষা বুদ্ধিজীবী মহলে খুব আলোড়ন ফেলল, প্রাণের স্বতঃজনন মতবাদ পরিত্যক্ত হল। প্রাণের সৃষ্টি কেবল প্রাণের থেকেই হয় - এই চিন্তা বিজ্ঞানী মহলে ছড়িয়ে পড়ল। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতে লাগলেন যে প্রাণ কখনও নিষ্প্রাণ বস্তু থেকে সৃষ্টি হয় না, প্রাণ সকল সময়ই কোন সজীব বস্তু থেকেই তার পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। ফলে প্রাণ সৃষ্টির কারণ রহস্যই থেকে গেল।

1.4.3 মহাপ্রলয় থেকে প্রাণের সৃষ্টির মতবাদ (Concept of Catastrophism)

ক্যুভিয়ার (1767-1832) ছিলেন একজন জীবাশ্ম বিজ্ঞানী (Paleontologist)। তিনি বিভিন্ন জীবাশ্মের ভৌগোলিক বিস্তার ও তার বয়স নির্ধারণ করতে গিয়ে তাদের মধ্যে এক অসমাঞ্জস্য লক্ষ করেন। তিনি এই অসামঞ্জস্যের ব্যাখ্যা করেন এই ভাবে যে - এই পৃথিবীতে অতীতে অনেকবার মহাপ্রলয় ঘটেছে এবং তার ফলে জীবকূল ধ্বংস হয়েছিল বার বার। প্রলয় শেষে আবার নতুন করে জীবের উৎপত্তি ও তাদের প্রসার লাভ ঘটেছিল। বস্তুতঃ ক্যুভিয়ারের মতবাদ অনেকটাই অ্যারিস্টোটলের মতবাদের অনুযায়ী অর্থাৎ প্রাণ আপনা আপনিই সৃষ্টি হতে পারে এবং অতীতে তা অনেকবার হয়েছে।

1.4.4 অন্য গ্রহ থেকে প্রাণের সঞ্চার (Concept of Extra-Terrestrial Origin of Life)

এই তত্ত্বের প্রবক্তা হেল্‌মহোজ (Helmholtz, 1864)। পরবর্তীকালে অনেক বিজ্ঞানী এই মতবাদের সমর্থক হয়ে ওঠেন। বিজ্ঞানী ক্যালভিন (Calvin, 1969), হয়েল ও বিক্রমসিংঘে (Hoyle and Wickramsinghe, 1977 & 1993); চাইবা ও সাগান (Chyba and Sagan, 1992) প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাঁদের মতে প্রাণের উৎপত্তি ঘটেছে আমাদের এই পৃথিবীর বাইরে অন্য কোন স্থানে এবং সেখান থেকে কোন বহিঃজাগতিক প্রক্রিয়ায় সেই প্রাণ পৃথিবীতে এসেছে।

এই তত্ত্বের স্বপক্ষে কয়েকটি প্রমাণ ঃ

(a) অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের মার্টিসন -এর কাছে 1967 সনে যে উল্কা পড়েছিল তা রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে তার মধ্যে ছিল 2% জৈব কার্বন, বেশ কয়েকপ্রকার অ্যামাইনো

অম্ল (যেমন - গ্লাইসিন, অ্যালানিন, ভ্যালিন প্রভৃতি), নিউক্লিয় অম্লের উপাদান পিরিমিডিন এবং সম্ভবতঃ পিউরিন।

(b) চাঁদের থেকে যে মাটি পৃথিবীতে আনা হয়েছিল তার মধ্যে সামান্য অ্যামাইনো অম্ল পাওয়া গেছে।

(c) আন্তঃগ্রহ স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন গ্রহাণুপুঞ্জের ধূলিকণার মধ্যে নানা ধরণের জৈব অণুর সন্ধান পাওয়া গেছে, যেমন - ফরম্যালডিহাইড, হাইড্রোসায়ানিক অম্ল, মিথাইল অ্যালকোহল প্রভৃতি।

এই তত্ত্বের বিপক্ষে কয়েকটি যুক্তি ঃ

(a) প্রথমতঃ এই মহাবিশ্বের বিভিন্ন গ্রহগুলি একে অপরের থেকে বহু-দূরে দূরে রয়েছে এবং সেই মহাশূন্য স্থান অতিক্রম করা কোন জীবিত বস্তুর পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

(b) দ্বিতীয়তঃ বর্হিঃবিশ্বে যে প্রচণ্ড বিকিরণ রয়েছে তা জীবনের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর এবং তা সহ্য করাও কঠিন।

(c) তৃতীয়তঃ আজ অবধি পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি।

1.4.5 প্রাণের রাসায়নিক উৎপত্তি (Chemical Origin of Life)

প্রাণের রাসায়নিক উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রথম মতবাদ প্রকাশ করেন আলেকজাণ্ডার ওপারিন নামে এক তরুণ রুশদেশীয় রসায়নবিদ 1924 সালে। তাঁর রচনাটি রুশ ভাষায় প্রকাশ হবার জন্য পশ্চিমের দেশের বিজ্ঞানীদের কাছে বিষয়টি অজানা ছিল বেশ কয়েক বছর। ইতিমধ্যে জে.বি. এস হলডেন নামে এক ব্রিটেনবাসী বিজ্ঞানী স্বতন্ত্রভাবে প্রাণের রাসায়নিক উৎপত্তি সম্বন্ধে বলেন। 1938 সালে ওপারিনের বিখ্যাত বই "প্রাণের উৎপত্তি" (Origin of Life) প্রকাশিত হয় ইংরাজী ভাষায়। ফলে পশ্চিম দেশের বিজ্ঞানীরা ওপারিনের মতবাদ সম্বন্ধে অবহিত হন। ওপারিন ও হলডেন-এর মতবাদ প্রায় একই হবার ফলে বিজ্ঞানী মহলে এই মতবাদ ওপারিন-হলডেন মতবাদ নামে প্রচলিত। পরবর্তীকালে অনেক বিজ্ঞানীর গবেষণায় প্রাপ্ত আরও তথ্য ও যুক্তির উপস্থাপনের ফলে এই মতবাদ আরও সমৃদ্ধ ও যুক্তিগ্রাহ্য হয়েছে। এই সব তথ্য একসাথে করলে আমরা এই বিষয়টিকে তিনটি বড় পর্যায়ে ভাগ করতে পারি। এই পর্যায়গুলো হল ঃ

(i) জটিল জৈব অণুর পূর্বসূরীদের উৎপত্তি

(ii) বিভিন্ন জটিল জৈব অণুর সৃষ্টি

(iii) জটিল জৈব অণু থেকে সংগঠিত "কোষ" বা আদি প্রাণীর সৃষ্টি।

1.4.5.1 জটিল জৈব অণুর পূর্বসুরীদের উৎপত্তি (Origin of Primordial Biomolecules)

জীবদেহ নানা জটিল অণু দিয়ে গঠিত। যেমন - প্রোটিন, শর্করা, ফ্যাট, নিউক্লিয় অম্ল প্রভৃতি। এই সমস্ত জটিল অণুগুলি অপেক্ষাকৃত সরল একক অণু দ্বারা গঠিত। যেমন প্রোটিনের একক অ্যামাইনো অম্ল, বহু শর্করার একক শর্করা, ফ্যাট এর একক ফ্যাট অম্ল ও নিউক্লিয় অম্লের একক হল নিউক্লিয়টাইড। নিউক্লিয়টাইড আবার তিন প্রকার উপাদান দিয়ে তৈরী, যথা পাঁচ কার্বন যুক্ত একক শর্করা, ফসফোরিক অম্ল ও নাইট্রোজেন যুক্ত ক্ষার। এই নাইট্রোজেন যুক্ত ক্ষার আবার দু'প্রকার পিউরিন ও পিরিমিডিন। এই অপেক্ষাকৃত সরল একক অণুর মধ্যে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল অ্যামাইনো অম্ল, পিউরিন ও পিরিমিডিন ক্ষার। কারণ প্রোটিন ও নিউক্লিয় অম্ল এই দুটি জটিল অণু সজীব বস্তুর অন্যতম প্রধান উপাদান, এই দুই প্রকার জৈব রাসায়নিক পদার্থ ছাড়া সজীব বস্তু হয় না। সুতরাং প্রাণ সৃষ্টির প্রথম পর্যায় হল এই জটিল জৈব অণুর পূর্বসুরীদের উৎপত্তি। এই ব্যাপারটা একটু বিস্তৃতভাবে দেখা যাক।

এই সরল একক অণুগুলো প্রধানতঃ কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (O), এবং নাইট্রোজেন (N), দ্বারা গঠিত। জীবন সৃষ্টির পূর্বে এই মৌলিক পদার্থ থেকে কিভাবে প্রাণ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় জটিল অণুর পূর্বসুরীরা তৈরী হয়েছিল সেই সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা কি বলেন?

ওপারিন - হ্যালডেন এর মতে - প্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় জৈব অণুর পূর্বসুরীরা আদিম পৃথিবীর পরিমণ্ডলে অবস্থিত বিভিন্ন বায়বীয় পদার্থের উপর পতিত শক্তি, যেমন-সৌর বিকিরণ, অতিবেগুনী রশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি প্রভৃতি দ্বারা সক্রিয় হয়ে জৈব অণুর পূর্বসুরীর উৎপত্তি হয়েছিল। তাদের এই অভিমত পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত ছিল না।

1.4.5.1.1 উরে -মিলারের পরীক্ষা

ওপারিন-হলডেন অভিমত-এর সঙ্গে কিছু তথ্য সংযোজন করলেন বিজ্ঞানী হ্যারল্ড উরে (Harold Urey)। উনি এই গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে এই ধারণায় উপনীত হলেন যে প্রাণ উদ্ভবের পূর্বে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে মূলতঃ হাইড্রোজেন ও হাইড্রোজেন ঘটিত যৌগ, যেমন মিথেন (CH_4), অ্যামোনিয়া (NH_3), এবং জলীয় বাষ্প (OH_2) ছিল; কিন্তু বাতাসে মুক্ত অক্সিজেন ছিল না। এই পরিবেশে বজ্রপাতের থেকে তড়িৎ মোক্ষণ হওয়ার ফলে ওই যৌগগুলো পরস্পর যুক্ত হয়ে বিভিন্ন অ্যামাইনো অম্ল তৈরী হয়ে থাকতে পারে। তাঁর এই ধারণা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করার জন্য তাঁর এক সুযোগ্য ছাত্র স্ট্যানলী মিলার-এর উপর তিনি দায়ীত্ব দিলেন।

মিলার তাঁর পরীক্ষা ব্যবস্থায় রাখলেন - (a) একটি জল ফোটানোর পাত্র যাতে তাপ দিয়ে অবিরত জলীয় বাষ্প তৈরী করা হল ও একটি নল পথে নির্গত হল। (b) সেই নল পথে একটি একমুখী পথ (valve) দিয়ে ক্রমাগত হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া ও মিথেন গ্যাস প্রবেশের ব্যবস্থা থাকল। (c) এই

চার প্রকার গ্যাসীয় পদার্থ নালী পথে প্রবেশ করল একটা পাঁচ লিটার আয়তনের কাঁচের আধারে (flask) যার মধ্যে রয়েছে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার যুক্ত সহ তড়িৎ মোক্ষণ ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অনেকটা প্রকৃতিতে সংঘটিত বজ্রপাতের অনুরূপ। (d) এই মোক্ষণ আধার থেকে নালী পথ গেছে একটি ঘনীভবন যন্ত্রে (condenser) যা কিনা প্রকৃতিতে বৃষ্টিপাতের অনুরূপ। (e) তারপর এই নালী যুক্ত হয়েছে একটি 'U' আকৃতির নালীতে যার মধ্যে ঘনীভবন জাত তরল জমা হবে এবং সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করার পথও রাখা আছে। সবশেষে 'U' নল পুনরায় জল ফুটানোর পাত্রের মধ্যে যুক্ত হয়। এর ফলে যে সমস্ত গ্যাসীয় পদার্থ অবিক্রিত থেকে গেল তারা ঐ তড়িৎদ্বার যুক্ত ফ্লাক্সের মধ্য দিয়ে বারবার যেতে থাকল। ক্রমাগত সাত দিন এই ব্যবস্থা চালানোর পরে 'U' নল থেকে তরল নিয়ে তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে তার মধ্যে অনেক রকমের জৈব যৌগ মিশে আছে। এই জৈব যৌগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কয়েকপ্রকারের অ্যামাইনো অম্ল, যেমন - গ্লাইসিন, অ্যালানিন, অ্যাসপারটিক অম্ল ও গ্লুটামিক অম্ল (চিত্র 1.2)

পরবর্তী সময়ে এই ধরনের পরীক্ষা অন্যান্য পরীক্ষাগারেও করা হয়েছে এবং তার ফলস্বরূপ প্রায় সকল 20 প্রকার অ্যামাইনো অম্লই, এমনকি পিউরিন, পিরিমিডিন, রাইবোজ প্রভৃতি জৈব যৌগও উৎপন্ন হতে দেখা গেছে।

1.4.5.2 বিভিন্ন জটিল জৈব অণুর সৃষ্টি

দ্বিতীয় পর্যায়ে একক জৈব অণুগুলো পরস্পর যুক্ত হয়ে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও জটিল জৈব অণুর সৃষ্টি হয়েছিল। এই ঘটনা খুব সম্ভব পাথরের উপরে বা উষ্ম মাটিতে বা উষ্ম প্রস্রবণের নির্গমন স্থলের পাশে ঘটেছিল। এই ঘটনা মুক্ত জলে ঘটেনি বলেই বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। কারণ মুক্তজলে একক অণুগুলো কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা অনেক কম।

প্রমাণ ঃ বিজ্ঞানী ফক্স (Fox, 1965) কিছু শুকনো অ্যামাইনো অম্ল কাদা মাটিতে নিয়ে 60ºC উষ্মতায় উত্তপ্ত করে দেখলেন যে তাতে পলিপেপটাইড তৈরী হয়েছে। বিজ্ঞানী ফক্স তাকে নাম দিলেন "প্রোটিনয়েড" বা ক্ষুদ্র প্রোটিন। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় তাপীয় ঘনীভবন (Thermal Condensation)।

একত্রীভবন (Coacervation) প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করেন বিজ্ঞানী জং (Jong, 1967)। তার মতে প্রাথমিক ভাবে উৎপন্ন বিভিন্ন কলয়েড পদার্থগুলো পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে এবং জলের অণু অপসারিত করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একত্র কণিকা (Coacervate Droplets) গঠন করেছিল। যেহেতু এই একত্র কণিকার চারপাশে একটা বিভেদ তল ছিল সেই হেতু ওই একত্র বিন্দুর মধ্যে অবস্থিত পদার্থগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অণু উৎপন্ন হবার সম্ভাবনা বেশী হয়েছিল।

জটিল জৈব অণুর সৃষ্টি নিয়ে আরও অনেক বিজ্ঞানীর মতবাদ আছে তবে স্থানাভাবের জন্য সবার

সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বলা সম্ভব হচ্ছে না। এই মতবাদগুলো থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে প্রাণ সৃষ্টির পূর্ব সময়ে সরল অণু থেকে জটিল জৈব অণু বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হতে থাকতে পারে।

1.4.5.3 জটিল জৈব অণু থেকে "সংগঠিত কোষ" বা আদি প্রাণীর সৃষ্টি (Origin of Organised Cell or Rise of Protobionts)

আদি প্রাণীর সৃষ্টির পর্যায়কে মোটামুটিভাবে বলা যায় প্রাণ সৃষ্টির অন্তিম পর্যায়। এই অবস্থায় বিভিন্ন জৈব অণুগুলি (Organic Macomolecules) পরস্পরের কাছাকাছি থেকে একটি পরস্পর নির্ভর অণু সমন্বয় এর মাধ্যমে একটি সুংসংবদ্ধ সংগঠন গড়ে উঠেছিল (Integrated molecular System) যা কিনা প্রায় সজীব পদার্থের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন।

সজীব বস্তুর প্রধান উপাদানগুলো ধীরে ধীরে তৈরী হওয়ার পরও কিছু বৈশিষ্ট বাকি থেকে গেল যা কিনা একটি এককোষী সজীব বস্তু সৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলি হল -

(a) একটি বহিরাবরণ - যা কিনা বাইরের পরিবেশ থেকে সজীব বস্তুটির আন্তঃপরিবেশের স্বাতন্ত্র রক্ষা করবে।

(b) উৎসেচক ক্রিয়ার সূচনা - উৎসেচক না থাকলে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি অত্যন্ত মন্থর হয়। সেইজন্য বিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হল উৎসেচক। বর্তমানে আমরা দেখতে পাই সমস্ত সজীব বস্তু এমনকি সকল সজীব কোষের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গেওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে নানা উৎসেচক। বর্তমানে দেখতে পাই যে উৎসেচক ছাড়া সজীবতা অচল।

(c) জনন - যে বৈশিষ্ট্য নিষ্প্রাণ জগতে অনুপস্থিত। এই বৈশিষ্ট্য বলে একটি সজীব বস্তু বা সজীব কোষ অনুরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এক বা একাধিক অপত্য সৃষ্টি করতে পারে।

(d) বিপাক - এই বৈশিষ্ট্যও সজীব বস্তুর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। একটি সজীব বস্তু সব সময় জনন কার্য নাও সম্পন্ন করতে পারে কিন্তু তার দেহে বা দেহের সজীব কোষের মধ্যে সকল সময় ঘটে চলেছে নানা জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া যাকে এককথায় বলা হয় বিপাক। এই জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমন্বয়কেই আমরা প্রাণ হিসাবে চিহ্নিত করি। কখনও এই বিপাক ক্রিয়া খুব কমে যায় তখন তাকে আমরা বলি সুপ্ত অবস্থা (Dormant State) আর যখন এই বিপাক একদম বন্ধ হয়ে যায় তখন তাকে আমরা বলি মৃত্যু।

প্রাণ সৃষ্টির শেষভাগে প্রাণের বৈশিষ্ট্যগুলি সামগ্রিকভাবে একসাথে হয়ে ঠিক কিভাবে একটি সংগঠিত সংগঠন হিসাবে গড়ে উঠল তা বিজ্ঞানী মহলে এখনও রহস্যপূর্ণ। যে ঘটনা এই পৃথিবীর বুকে প্রায় 350 কোটি বছর আগে ঘটেছিল, সে ঘটনার অনুরূপ নিদর্শন এখনও পর্যন্ত অন্য কোন গ্রহে পাওয়া

যায়নি এই রকম একটি ঘটনার রহস্য উদ্ধার করতে বিজ্ঞানীদের আরও সময় লাগবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি। আসলে সেই প্রাণ সৃষ্টি রহস্য হল মাত্র একটি অধ্যায়। তারপর ঘটনা গড়িয়ে চলল অন্য এক অধ্যায়ে, তা হল প্রাণ সৃষ্টি পরবর্তী ঘটনা যে ঘটনার মধ্য দিয়ে এক সরল জীব থেকে ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হল অসংখ্য রকমারী জীব, যা কিনা জৈব অভিব্যক্তি নামে পরিচিত। আসুন এবার আমরা সেই ঘটনার উপর একটু আলোকপাত করি।

অনুশীলনী - 3

1. প্রথম স্তম্ভের সঙ্গে দ্বিতীয় স্তম্ভের বক্তব্যের জোড় বাঁধুন।

(a) বিশেষ-সৃজন মতবাদ	(i) পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে বারবার
(b) স্বতঃজনন মতবাদ	(ii) উল্কার মধ্যে জৈব কার্বন পাওয়া গেছে
(c) মহাপ্রলয় থেকে প্রাণের সৃষ্টি	(iii) উরে-মিলারের পরীক্ষা
(d) প্রাণ অন্য গ্রহ থেকে পৃথিবীতে এসেছে	(iv) ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই এই প্রাণী সৃষ্টি হয়েছে
(e) প্রাণের রাসায়নিক উৎপত্তি	(v) মাংসের মধ্যে আপনা থেকে কীটের জন্ম হয়

1.5 জীবনের বিভিন্নতা (Diversity of Life)

এ পর্যন্ত যে আলোচনা হল তাতে আপনি কিভাবে প্রাণ সৃষ্টি হল তার কিছু ধারণা পেলেন। কিন্তু একটা বিষয় স্পষ্ট হল না যে এত বিভিন্ন রকমের প্রাণী সৃষ্টি হল কিভাবে? প্রাণী যখন প্রাণের আধার তাহলে আধারের এত বিভিন্নতা কেন? তাহলে প্রশ্ন জাগতে পারে এই এত বিভিন্ন রকমের প্রাণের আধারও কি আলাদা আলাদা ভাবে সৃষ্টি হয়েছিল?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চিন্তাশীল মানুষ বহুদিন ধরে ভেবেছে। নানা চিন্তার অবতারণা হয়েছে। তার কোনোটা বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ পছন্দ করেছে কোনোটা বা করেনি। তারমধ্যে সবচেয়ে যুক্তিগ্রাহ্য ও বিজ্ঞানসম্মত ধারণা হল -আজকের দিনের এই হাজার হাজার প্রকারের প্রাণীর উৎপত্তি ঘটেছে প্রাণীদের ক্রম পরিবর্তন অর্থাৎ জৈব বিবর্তনের ফলে। বিভিন্ন কারণের ফলে জীবগোষ্ঠীদের মধ্যে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটে আর সময়ের ব্যবধানে এই পরিবর্তন আস্তে আস্তে পুঞ্জীভূত হয়ে মূল জীবগোষ্ঠী থেকে জননগত ভাবে পৃথক হয়ে গেলে নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়। এই ভাবেই আজকের পৃথিবীতে এই অসংখ্য রকম প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে। আজ থেকে প্রায় 350 কোটি বছর আগে যে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল তা এত বছর ধরে জীবকে আশ্রয় করে প্রবাহিত হতে হতে ঘটেছে তার বিভিন্নতা, বয়ে চলেছে বিভিন্ন ধারায়। এই বিভিন্নতা সৃষ্টির পদ্ধতিকেই আমরা বলি "জৈব বিবর্তন" (Organic Evolution)।

1.5.1 বিভিন্নতার মাঝে ঐক্য (Unity in Diversity)

পৃথিবীর বুকে বর্তমানে অসংখ্য রকমের জীব বাস করে। অতীতেও অনেক রকমের জীব বাস করে গেছে, তাদের কেউ কেউ এখনও অপত্যের মধ্যে বেঁচে আছে, কেউবা অবলুপ্ত হয়ে গেছে। অতীত ও বর্তমান মিলিয়ে এই অগুন্তি প্রাণীরা কি সবাই আলাদা আলাদা নাকি তাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে। যুক্তিবাদী মানুষের একান্ত প্রচেষ্টায় আবিষ্কৃত হয়েছে এই সৃষ্ট জীবেদের বিভিন্নতার মাঝে ঐক্য। এই কথা থেকে আপনারা মনে না করেন সমস্ত রকমের জীবগোষ্ঠীর মধ্যে অবস্থিত ঐক্য ইতিমধ্যেই মানুষের জানা শেষ হয়ে গেছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা একমত হতে পারেন নি। আগামী দিনে আরও উন্নত জ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে সেই সন্দেহ নিরসন হবে বলে আমরা আশা রাখি।

1.5.2 ঐক্য নির্দ্ধারণ হয় কিভাবে? (How the Unity is Determined?)

প্রাণীদের বিভিন্নতার মাঝে ঐক্য নির্দ্ধারণ করা কিন্তু সহজ কাজ নয়। কি পদ্ধতিতে ঐক্য নির্দ্ধারণ হয় তা জানা থাকলে আপনি বুঝতে পারবেন পদ্ধতিটা কেন জটিল আর কেনই বা বিজ্ঞানীরা কখনও কখনও সহমত হতে পারেন না নিজেদের মধ্যে।

প্রাণীদের মাঝে ঐক্য নির্দ্ধারণ করা কেন কঠিন তা বোঝানোর জন্য একটা সাদৃশ্যমূলক ঘটনা উপস্থাপন করি তাহলে বিষয়টা একটু পরিষ্কার হবে। মনে করুন আমরা একটা সামাজিক অনুষ্ঠানে আত্মীয়স্বজন এক জায়গায় হলাম। সেখানে দেখা গেল আমার ছেলে 'ক' (ধরা যাক তার নাম) আমার খুড়তুতো ভাই এর ছেলেকে (ধরা যাক তার নাম 'খ') চেনে না, কারণ এর আগে এদের দুজনের মধ্যে কোন দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। আমি 'ক' ও 'খ' দুজনকেই ডেকে পরস্পরের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম। এই পরিচয় করানোর পরে 'ক' জানল যে 'খ' তার ভাই। এক্ষেত্রে দেখুন আমি 'ক' এবং 'খ' এর মধ্যে সম্পর্ক নির্দ্ধারন করিয়ে দিলাম। কিন্তু যদি এমন হয় যে আমি সেখানে অনুপস্থিত অথবা 'ক' বা 'খ' এর মধ্যে পরিচয় করিয়ে দেবার মত কেউ নেই তাহলে কি হবে? একটা উপায় হল এই যে 'ক' আর 'খ' যদি তাদের পূর্বপুরুষদের নাম জিজ্ঞাসা করে (অবশ্য তারা যদি সেই নামগুলো জানে) তাহলে দেখা যাবে দুজনেরই প্রপিতামহ (ঠাকুরদাদার বাবা) একই ব্যক্তি। অর্থাৎ 'ক' ও 'খ' একই ব্যক্তির উত্তরসূরী এবং তারা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ভাই। এর থেকে না হয় বোঝা গেল মানুষের মধ্যে সম্পর্ক কি ভাবে নির্দ্ধারণ করা যায়। কিন্তু অন্যান্য জীব জন্তুদের ক্ষেত্রে কি হবে? তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক কে বলে দেবে? এবার নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে যে এই সম্পর্ক মানুষকেই নির্দ্ধারণ করে নিতে হয় এবং তা কিন্তু খুব একটা সহজ নয়।

আমরা অনেক সময়ই দেখেছি যে এক পরিবারভুক্ত মানুষদের মধ্যে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়

যা অনেকের মধ্যেই আছে। যেমন গায়ের রং দেহের গড়ন, কথা বলার ধরণ, গলার স্বর, হাঁটা চলা, বিভিন্ন দেহ অঙ্গের আকৃতি প্রভৃতি নানা বৈশিষ্ট্য। এই চিন্তা ও যুক্তিকে সামনে রেখে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেন জীবগোষ্ঠীদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানতে, তারপর সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের তুলনা করে বিজ্ঞানীরা নির্দ্ধারণ করেন পারস্পরিক সম্পর্ক। সাধারণভাবে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য দেখা হয় তার কয়েকটি হল - বহিঃআকৃতি (Morphology), অঙ্গসংস্থান (Anatomy), কলাস্থান (Histology), ভ্রূণ গঠন (Embryology), শারীরতত্ত্ব (Physiology), জৈব রসায়ন (Bio-chemistry) প্রভৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান। এই জ্ঞানগুলো প্রত্যেকটাই হল বিশিষ্ট্য প্রকারের (Specialised Knowledge) তাই একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে সব রকম জ্ঞান আহরণ করে জীবগোষ্ঠীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করা হয়ে ওঠে না। নতুন জ্ঞান বা পদ্ধতি দ্বারা বিচার বিশ্লেষণের ফলে কখনও এই সম্পর্কের পুনঃনির্দ্ধারণ ঘটে আবার কখনও বা পূর্ব নির্দ্ধারিত সম্পর্কের সপক্ষে আরও যুক্তির সমর্থন মেলে। এইভাবেই এই বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে উন্নত থেকে উন্নততর স্তরে।

1.5.3 বিভিন্ন প্রকার প্রাণী গোষ্ঠী (Different Kinds of Animal Groups)

প্রাণীবিজ্ঞানীরা সমগ্র প্রাণীকুলকে প্রায় 38 টা বড় গোষ্ঠীতে অর্থাৎ পর্বে (Phylum) ভাগ করেছেন। তারা হল ঃ-

* (1) সারকোম্যাস্টিগোফোরা (Sarcomastigophora)
(2) ল্যাবরিন্থোমরফা (Labyrinthomorpha)
* (3) এপিকমপ্লেক্সা (Apicomplexa)
(4) মাইক্রোস্পোরা (Microspora)
(5) অ্যাসটোস্পোরা (Ascetospora)
(6) মিক্সোজোয়া (Myxozoa)
* (7) সিলিওফোরা (Ciliophora)
(8) প্লাকোজোয়া (Placozoa)
* (9) পরিফেরা (Poriferea)
* (10) নিডারিয়া (Cnidaria)
(11) টিনোফোরা (Ctenophora)
* (12) প্লাটিহেলমিনথিস (Platyhelminthes)

(13) নিমার্টিয়া (Nemartea)

(14) ন্যাথোস্টোমুলিডা (Gnathostomulida)

(15) মেসোজোয়া (Mesozoa)

(16) গ্যাস্ট্রোট্রিকা (Gastrotricha)

(17) রটিফেরা (Rotifera)

(18) কাইনোরিস্কা (Kinorhyncha)

* (19) নিমাটা (Nemata)

(20) নিমাটোমরফা (Nematomorpha)

(21) অ্যাকান্থোকেফালা (Acanthocephala)

(22) প্রায়াপুলিডা (Priapulida)

* (23) মোলাস্কা (Mollusca)

* (24) অ্যানিলিডা (Annelida)

(25) পোগোনোফোরা (Pogonophora)

(26) ইকিউরা (Echiura)

(27) সাইপানকুলা (Sipuncula)

* (28) আর্থ্রোপোডা (Arthropoda)

(29) ওনাইকোফোরা (Onychophora)

(30) টার্ডিগ্রাডা (Tardigrada)

(31) ফোরোনিডা (Phoronida)

(32) ব্রায়োজোয়া (Bryozoa)

(33) এন্টোপ্রক্টা (Entoprocta)

(34) ব্রাকিওপোডা (Braciopoda)

(35) কিটোগ্নাথা (Chaetognatha)

* (36) একাইনোডার্মাটা (Echinodermata)

(37) হেমিকর্ডাটা (Hemichordata)

* (38) কর্ডাটা (Chordata)

এই 38 সংখ্যক পর্বের মধ্যে প্রথম 7 টি পর্ব আগে একসাথে বলা হত পর্ব প্রোটোজোয়া, বর্তমানে বলা হয় উপরাজ্য প্রোটোজোয়া (Subkingdom Protozoa)। এই পর্বগুলোর মধ্যে কতকগুলোকে বলা হয় অধিক পরিচিত পর্ব (Major Phyla), যা উপরের তালিকায় তারকা (*) চিহ্নিত, আর বাকি পর্বগুলোকে বলা হয় অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত পর্ব (Minor Phyla)। আজ পর্যন্ত প্রায় 20 লক্ষের মত সজীব বস্তুর প্রজাতি জনা গেছে, আরও জানার অপেক্ষায় রয়েছে, এর থেকেই বোধহয় আন্দাজ করা যায় জীবনের বিভিন্নতা কত ব্যাপক। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এই সম্পর্কে আরও জানতে পারবেন। প্রধান প্রাণীপর্বগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক রেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল (চিত্র : 1.3)।

1.6 সারাংশ

এই এককটি পাঠ করে আপনারা শিখেছেন

- প্রাণের স্বরূপ কি?
- প্রাণ ও প্রাণীর সম্পর্ক কি?
- পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি ব্যাখ্যার জন্য উপস্থাপিত বিভিন্ন মতবাদ।
- আপনারা বিশেষ করে জেনেছেন প্রাণের রাসায়নিক সৃজন সম্পর্কে ওপারিন - হলডেন মতবাদ।
- প্রাণের রাসায়নিক সৃজন মতের সমর্থনে উরে-মিলারের পরীক্ষা ও আরও অন্যান্য বিজ্ঞানীর পরীক্ষা ও ধারণা
- প্রাণের উৎপত্তির পরে তার বিভিন্নতা প্রাপ্তি হল কিভাবে?
- বিজ্ঞানীরা কিসের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রাণীদের গোষ্ঠীভুক্ত করেন।
- প্রাণীকুলের প্রধান গোষ্ঠীভুক্ত পর্বগুলো কি কি?

1.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

(a) প্রাণ ও প্রাণীর মধ্যে সম্পর্ক কি?

(b) জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?

(c) সজীব বস্তু কাকে বলে?

(d) পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদগুলি কি কি?

(e) প্রাণ সৃষ্টির আদি পর্বে জটিল জৈব-অণুর পূর্বসুরীদের উৎপত্তি হয়েছিল কিভাবে?

(f) জটিল জৈব অণু থেকে একটি "সংগঠিত কোষ" সৃষ্টি হয়েছিল কোন বৈশিষ্ট্যের সমাগমে?

(g) পৃথিবীতে এই হাজার হাজার প্রকারের জীব কি সৃষ্টি হয়েছে আলাদা আলাদা ভাবে? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখান।

1.8 উত্তরমালা

অনুশীলনী-1

1. (a) মিথ্যা*; (b) সত্য; (c) সত্য; (d) মিথ্যা

2. (a) কার্বন, অক্সিজেন, ফসফরাস; (b) অপচয়

(* অ্যামিবা নামক প্রাণীর নির্দ্দিষ্ট আকার নাই।)

অনুশীলনী-2

1. (a) কোষ; (b) নিউক্লিয়াস, (c) রাইবোজোম, (d) কোষপর্দা

অনুশীলনী-3

1. (a) - iv, (b) -v, (c) - i, (d) - ii, (c) - iii

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

(a) 1.2 এর শেষ ছত্রে দেখুন

(b) 1.2.1 দেখুন

(c) সজীব বস্তু হল কিছু জটিল রাসায়নিক পদার্থের সু-সংগঠিত সংগঠন যা পরিবেশ থেকে শক্তি আহরণ করে নিজের জৈবিক কাজে নির্দ্দিষ্ট ছন্দে ব্যবহার করে।

(d) 1.4 দেখুন

(e) 1.4.5.1 দেখুন

(f) 1.4.5.3 দেখুন

(g) 1.5 দেখুন

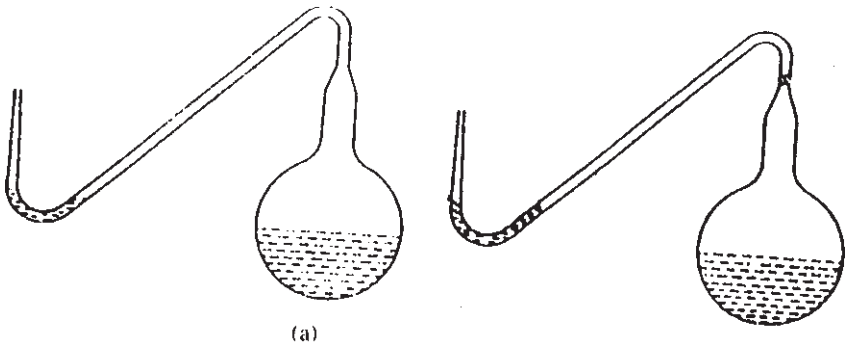

(চিত্র নং 1.1 ঃ সজীববস্তু বায়ুদ্বারাও বাহিত হয়ে থাকে - এই যুক্তির সপক্ষে পাস্তুরের পরীক্ষার রেখচিত্র। (a) দীর্ঘ রাজহংস-গলাযুক্ত ফ্লাক্সে পুষ্টি সামগ্রী সমেত নির্যাসপূর্ণ করে ফুটিয়ে রেখে দেওয়া হল। কিছুদিন পরে দেখা গেল যে নির্যাসে পচন ধরেনি অর্থাৎ জীবের বিকাশ ঘটেনি। (b) অনুরূপ পরীক্ষার পরে একটি ফ্লাস্কের লম্বাগলা ভেঙে রেখে দেখা গেল নির্যাসটির পচন ধরেছে অর্থাৎ জীবের বিকাশ হয়েছে।

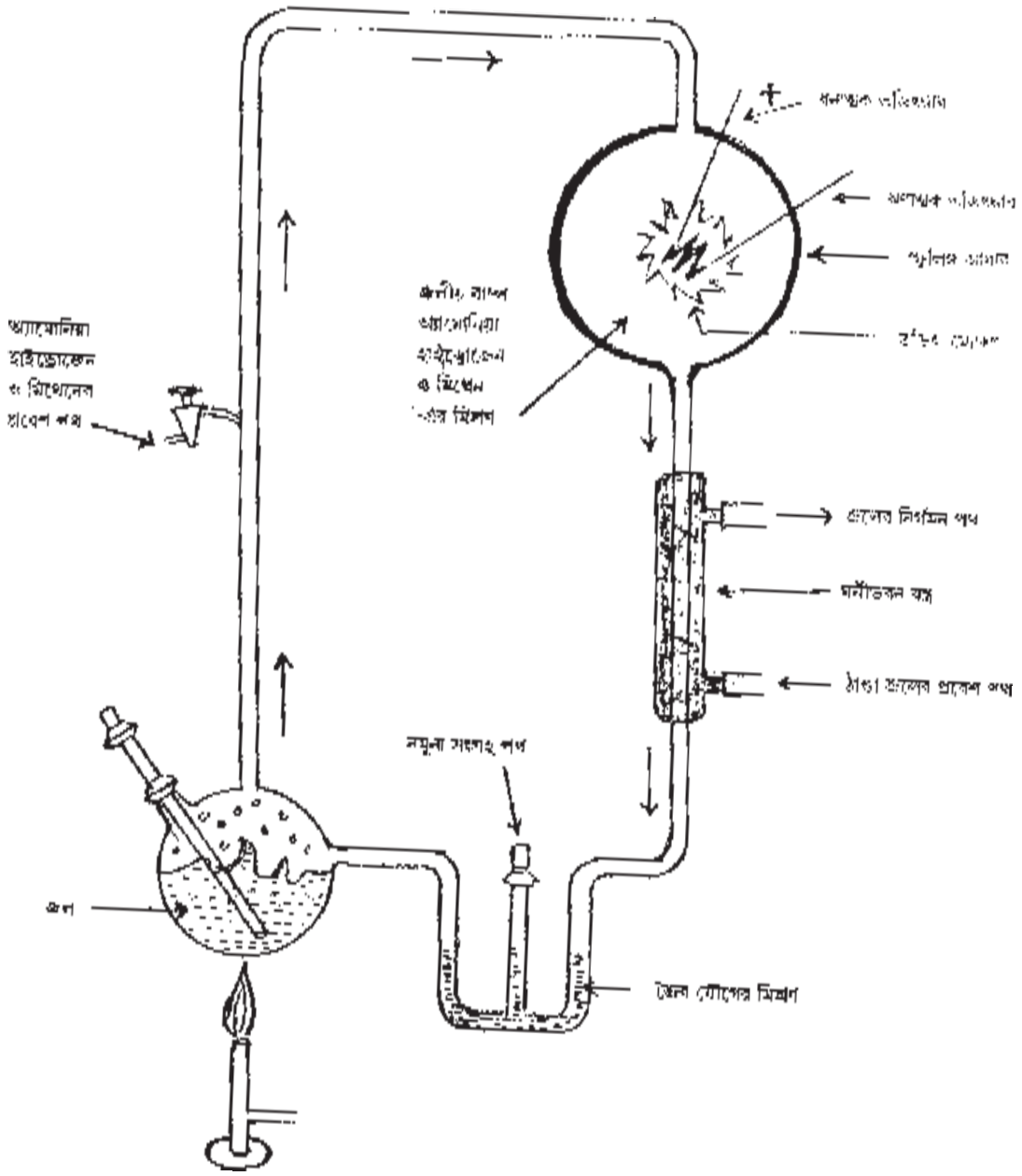

চিত্র (1.2) ঃ উরে-মিলারের পরীক্ষা পদ্ধতির রেখচিত্র

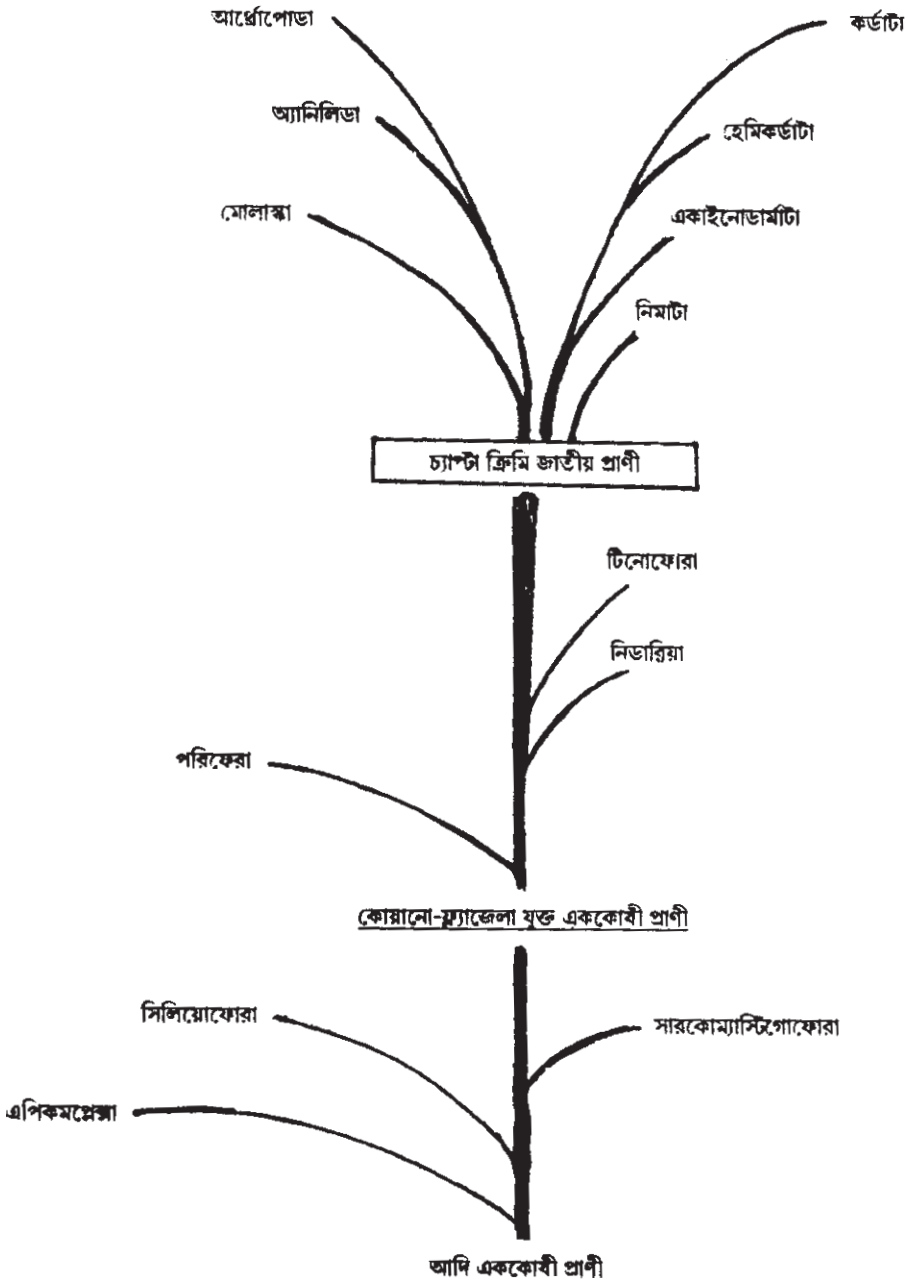

চিত্র (1.3) ঃ উৎপত্তিগত সম্পর্ক বিবেচনা করে বিভিন্ন প্রধান প্রাণীপর্ব গুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের রেখচিত্র।

একক 2 ❑ প্রাণীদের প্রতিসমতা, আকার এবং জীবনধারণ পদ্ধতি

গঠন

2.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

2.2 প্রতিসমতা

দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসমতা

অরীয় প্রতিসমতা

দ্বি-অরীয় প্রতিসমতা

দৃশ্যকোণ

বিভেদ রেখা ও বিভেদতল

2.3 আকার

জীববিজ্ঞানীদের ব্যবহৃত কয়েকটি ক্ষুদ্র একক

বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রাণীদের আকার

2.4 জীবন ধারণ পদ্ধতি

শ্বসন ও শ্বাসবায়ু গ্রহণ পদ্ধতি অনুসারে

বাসস্থান অনুসারে

বাসস্থান-জল

বাসস্থান-জল ও স্থল

বাসস্থান - স্থল

খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি অনুসারে

রেচন পদ্ধতি অনুসারে

জনন পদ্ধতি অনুসারে

ভ্রূণাণুর পরিস্ফুটন পদ্ধতি অনুসারে

জীবনচক্র অনুসারে

2.5 সারাংশ

2.6 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

2.7 উত্তরমালা

2.1 প্রস্তাবনা

আগের একক পাঠ করে আপনারা জানতে পেরেছেন কি করে প্রাণ সৃষ্টি হল আর তারপরে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে প্রাণীকূল হয়ে উঠল বৈচিত্রময়। এই বৈচিত্রময় প্রাণীদের সম্বন্ধে আমরা জানবো কিভাবে? এই জানার কি কোন পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া বা নিয়ম আছে? নাকি যেমনখুশী ভাবে একটা প্রাণী বা জীবগোষ্ঠীকে জানলেই হবে? এর উত্তরে বলতে হয় - না, প্রাণীদের বিক্ষিপ্তভাবে জানলে হবে না, তাদেরকে এক নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মতভাবে জানা হয় অথবা বলা যেতে পারে জানার চেষ্টা করা হয়। এই জানা নির্ভর করে প্রধানতঃ কতটা সুযোগ আছে তার উপর। নতুন নতুন কারিগরী দক্ষতা (Technical Skill) বৃদ্ধি ও নতুন পদ্ধতি (Method) আবিষ্কারের ফলে জানার সীমাও বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে কখনও আরও গভীর ভাবে জানা যাচ্ছে।

আমরা যখন কোন মানুষ সম্বন্ধে জানতে চাই তখন আমরা কি কি বিষয় জানতে চাই? সেই মানুষের শুধু দৈহিক গঠন জানলেই হল না, তার শিক্ষা, দীক্ষা, কর্ম, রুচি, চিন্তাধারা, বংশপরিচয় প্রভৃতি নানা বিষয়ে জানলে তবেই মানুষকে ভাল ভাবে জানা যায়। ঠিক সেইমতই প্রাণীদের নানা বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করে গঠনগত ও গুণগত বৈশিষ্ট্য, আমরা যত ভাল ভাবে নির্ণয় করতে পারবো তত ভালভাবে সেই প্রাণী বা প্রাণীগোষ্ঠীর চারিত্রায়ন (Characterisation) করা সম্ভব হবে। মনে প্রশ্ন জাগতে পারে এই সব করে কি পাব? এর দরকারই বা কি? প্রাণীজগতে এই যে বিভিন্নতা তা পরিমাপ করতে এবং বিভিন্ন প্রাণীগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে এই জ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই অধ্যায়ে সেই হিসাবে প্রয়োজনীয় পন্থা ও বিচার পদ্ধতির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো।

উদ্দেশ্য ঃ

এই এককটি পাঠ করলে আপনি

- প্রতিসমতা কি, এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা করতে পারবেন।
- প্রতিসমতার প্রকারভেদ ও তাদের স্বরূপ নির্দেশ করতে পারবেন।

- ক্ষুদ্র প্রাণীদের পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত এককগুলির উল্লেখ করতে পারবেন।
- প্রাণীদের বিভিন্ন আকার সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবেন।
- প্রাণীদের বিভিন্ন জীবনধারণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবেন।

2.2 প্রতিসমতা (Symmetry)

আমরা কখনও কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে বলে থাকি, যেমন অমুক ব্যক্তির ডানচোখটা একটু ছোট বা বাঁ কাঁধটা একটু বেশী ঢালু বা ডান হাতটা একটু বেশী লম্বা এইরকম আরও কত কি। আসলে আমরা বোঝাতে চাইছি যে সেই ব্যক্তির সেই অঙ্গটি দুপাশে সমান নেই অথবা সমানভাবে অবস্থিত নেই ফলে তার দৈহিক সামঞ্জস্য নষ্ট হয়েছে। সেই ব্যক্তির দুটো চোখ, দুটো হাতই যদি সমান আকারের হত বা দুদিকের কাঁধই সমান ঢালু হত তাহলে আমরা এই রকম কথা বলতাম না। আমাদের ক্ষেত্রে দুদিকের অঙ্গের আকার ও অবস্থান সমান ও সামঞ্জস্যপূর্ণ না থাকলে আমাদের চোখে দৃষ্টিকটু মনে হয় অর্থাৎ আমরা বোঝাতে চাই দেহের প্রতিসমতা ভঙ্গ হয়েছে কারণ সেই অঙ্গ বা অঙ্গগুলি অসমান অথবা অসমাঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে রয়েছে। একখণ্ড পাথরের টুকরো বা একখণ্ড অসমান ইঁটের টুকরো কোনভাবেই সমান আকৃতির দুটো অংশে ভাগ করা যায় না এইরকম বস্তুকে আমরা বলে থাকি অপ্রতিসম (Asymmetrical) (চিত্র 2.1a) প্রাণীজগতেও এর উদাহরণ আছে যেমন - অ্যামিবা, এন্টামিবা (চিত্র 2.1 b,c)।

সুতরাং প্রতিসমতা বলতে বোঝানো হয় কোন অক্ষ বা তলের দুপাশে বিভিন্ন অঙ্গের সমান ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাস। বিন্যাসের প্রকারভেদ অনুসারে প্রতিসমতার প্রকারভেদ আছে। নীচে তা আলোচনা করা হল।

2.2.1 দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসমতা (Bilateral Symmetry)

যখন কোন বস্তুর বিভিন্ন অংশগুলি একটি মাত্র তলের বা অক্ষের দুপাশে সমান ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে অবস্থান করে তখন তাকে দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসমতা বলে। এক্ষেত্রে বস্তুটিকে সমান দুটি অংশে ভাগ করা যাবে যদি তাকে শুধু একটি মাত্র তলে বিভক্ত করি (চিত্র 2.1 d)। দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসম বস্তু আমাদের আশে পাশে অনেক আছে, যেমন - হাতা, খুন্তি, চামচ, চেয়ার প্রভৃতি। প্রাণীজগতেও অনেক উদাহরণ আছে, যেমন - মশা, মাছি, কাঁকড়া, চিংড়ি, কেঁচো, জোঁক, মাছ, ব্যাঙ, সাপ, টিকটিকি, পাখী, পশু এমনকি মানুষ। বস্তুত- অ্যানিলিডা, আর্থ্রোপোডা, মোলাস্কা ও কর্ডাটা পর্বগুলোর একটা বৈশিষ্ট্য হল দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসমতা (চিত্র 2.1 e-h)।

2.2.2 অরীয় প্রতিসমতা (Radial Symmetry)

যখন কোন বস্তুকে একের বেশী তল দিয়ে বিভক্ত করলে পরেও দুটি সমান ভাগে ভাগ করা যায় তখন সেই প্রতিসমতাকে বলে অরীয় প্রতিসমতা। যেমন ধরুন একটা খাবার থালা অথবা তারামাছের মত কোন প্রাণী (চিত্র 2.1 i), একে অনেকগুলো তল দিয়ে ভাগ করলে দুটো সমান অংশ হবে। আমাদের আশেপাশে আরও অনেক বস্তু দেখতে পাই যারা অরীয় প্রতিসম সম্পন্ন, যেমন - শিশি, বোতল, জলের গ্লাস, ঘটি, বাটি, হাঁড়ি, গামলা ইত্যাদি। প্রাণী জগতেও অনেক উদাহরণ দেখা যায়, যেমন - হাইড্রা, জেলিফিস, সাগর কুসুম, তারা মাছ, সমুদ্রশশা প্রভৃতি (চিত্র 2.1 j,k,m)। প্রকৃতপক্ষে পরিফেরা, নিডারিয়া, একাইনোডামাটা পর্বের অন্তর্গত প্রাণীদের অরীয় প্রতিসমতা লক্ষ করা যায়।

2.2.3 দ্বি-অরীয় প্রতিসমতা (Biradial Symmetry)

যখন কোন মূলতঃ অরীয় প্রতিসম বস্তুর সাথে একটি অথবা দুটি অংশ এমনভাবে যুক্ত হয় যাতে তার মূল অরীয় প্রতিসমতা নষ্ট হয়ে বস্তুটি দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসমতে পরিণত হয় তখন তাকে দ্বি-অরীয় প্রতিসমতা বলে। যেমন ধরা যাক চায়ের পেয়ালা। পেয়ালার হাতলটি না থাকলে তাকে আমরা বলতাম অরীয় প্রতিসম বস্তু কিন্তু হাতলের উপস্থিতির জন্য তা পরিণত হয়েছে দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসম বস্তুতে। এরূপ ক্ষেত্রে এই বস্তুটিকে বলা হবে দ্বিঅরীয় প্রতিসম বস্তু (চিত্র 2.1, n)। প্রাণীদের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণতঃ টিনোফোরা পর্বভুক্ত প্রাণীদের মধ্যে এই প্রতিসমতা দেখতে পাই (চিত্র 2.1, l)। দুটি কর্ষিকার উপস্থিতির জন্য এদের অরীয় প্রতিসমতা নষ্ট হয়ে দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসমতায় পরিণত হয়।

2.2.4 দৃশ্যকোণ (Angle of view)

কোন একটি ত্রিমাত্রিক বস্তুকে দেখার দৃশ্যকোণের পরিবর্তনের সাথে সাথে তার চিত্র পরিবর্ত্তিত হতে থাকে। যেমন একটা বাড়ী সামনে থেকে দেখলে যেরকম মনে হবে, তা পাশ থেকে বা পিছন থেকে অথবা উপর থেকে দেখলে তা দেখতে অন্যরকম হবে। যেহেতু বেশীরভাগ প্রাণীই ত্রিমাত্রিক আকার বিশিষ্ট তাই তাদের বর্ণনার সময় দৃশ্যকোণের কথাও বলার দরকার হয়। সেই হিসাবে কয়েকটি দৃশ্যকোণের নাম দেওয়া হয়েছে যেমন -

(a) অঙ্কীয় (Ventral) - যখন অঙ্কদেশ বা পেটের দিক বা ভূসংলগ্ন দিক থেকে দেখা হয়।

(b) পৃষ্ঠীয় (Dorsal) - যখন পৃষ্ঠদেশ বা পিঠের দিক থেকে দেখা হয়।

(c) পার্শ্বীয় (Lateral) - যখন পাশ থেকে দেখা হয়।

(d) মুখপ্রান্তস্থ (Oral) - যখন মুখপ্রান্ত দিক থেকে দেখা হয়।

(e) বিমুখ প্রান্তস্থ (Aboral) -যখন মুখপ্রান্তের বিপরীত দিক থেকে দেখা হয়।

(f) অগ্রদেশীয় (Anterior) - যখন দেহের সামনের দিক অর্থাৎ যে দিকে দেহ -অগ্রসর হয় সেই দিক থেকে দেখা হয়। অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রে মুখপ্রান্তস্থ দৃশ্য আর অগ্রদেশীয় দৃশ্য একই।

(g) পশ্চাৎদেশীয় (Posterior) - যখন দেহের পিছনের দিক থেকে দেখা হয়। (চিত্র 2.2, a, b)।

2.2.5 বিভেদ রেখা ও বিভেদ তল (Dividing Axis and Plane)

কখনও কোন প্রাণীর দেহের অন্তর্গঠন বর্ণনা করার সময় প্রাণীটিকে বিভিন্ন তলে বিভেদিত করার পরের দৃশ্য বর্ণনা করতে হয়। এইরকম কয়েকটি বিভেদরেখা বা বিভেদতল হল -

(a) অনুদৈর্ঘ্য অক্ষ (Longitudinal Axis) - মাথার সামনে থেকে দেহের শেষ পর্যন্ত দেহ দৈর্ঘ্য বরাবর অক্ষকে বলা হয়।

(b) সম্মুখদেশীয় তল (Frontal Plane) হল দেহের অনুদৈর্ঘ্য অক্ষ ধরে দেহকে যদি এমনভাবে বিভক্ত করি যাতে দেহটি একটি পৃষ্ঠদেশীয় ও অন্যটি অঙ্কদেশীয় অংশে বিভক্ত হয় তাকে সম্মুখদেশীয় তল বলে। (চিত্র 2.2, c)।

(c) পার্শ্বদেশীয় তল (Sagittal Plane) হল দেহের অনুদৈর্ঘ্য অক্ষ ধরে দেহকে যদি এমনভাবে বিভক্ত করি যাতে দেহটি একটি বাঁ এবং অপরটি ডান পার্শ্বখণ্ডে বিভক্ত হয় সেই তলকে পার্শ্বদেশীয় তল বলে (চিত্র 2.2, d)।

(d) অনুপ্রস্থ তল (Transverse Plane) অনুদৈর্ঘ্য রেখার সাথে উলম্বভাবে যে তল দেহকে অগ্র ও পশ্চাৎ এই দুই ভাগে ভাগ করে তাকে অনুপ্রস্থ তল বলে। এই তল দেহের বিভিন্ন স্থানে হাতে পারে (চিত্র 2.2, e)।

অনুশীলনী-1

1. নিম্নলিখিত বস্তু / প্রাণীগুলিকে প্রতিসমতা অনুযায়ী গোষ্ঠীভুক্ত করুন

(a) হাইড্রা, (b) হাতা, (c) জোঁক, (d) থালা, (e) হাঁড়ি, (f) চায়ের কাপ, (g) জেলিফিস, (h) রুইমাছ, (i) কেঁচো, (j) হর্মিফোরা (টিনোফেরা পর্বভুক্ত প্রাণী), (k) অ্যামিবা।

2. মানুষের দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসমতা প্রকাশ পায় যদি তাকে ——— অক্ষ দিয়ে দেহটি বিভক্ত করা হয়।

2.3 আকার (Size)

প্রাণীদের আকার অনেক রকমের হতে পারে, যেমন - বৃহৎ, অতি বৃহৎ, ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র, আনুবীক্ষণিক, অতি আণুবীক্ষণিক। ব্যাপারটা একটু বিস্তৃতভাবে বললে বোধ হয় বিষয়টা একটু পরিষ্কার হবে। বৃহৎ বা ক্ষুদ্র এই শব্দগুলো আপেক্ষিক, অর্থাৎ তুলনামূলক শব্দ। আমি যাকে বৃহৎ বললাম আর একজন হয়ত তাকে বৃহৎ বলতে রাজী নন। তাহলে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেবে। সেইজন্য আপেক্ষিক শব্দের বদলে একক এর সাহায্যে অর্থাৎ দৈর্ঘ্যের বৃহৎ বা ক্ষুদ্র এককের সাহায্যে প্রকাশ করলে তাহলে আর কোন সমস্যা থাকে না। এই কথা মনে রেখে কতকগুলি ক্ষুদ্র একক জীববিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেন।

2.3.1 জীববিজ্ঞানীদের ব্যবহৃত কয়েকটি ক্ষুদ্র একক আজকাল জীববিজ্ঞানের সমস্ত শাখায় মেট্রিক পদ্ধতিতে পরিমাপ করা হয়। যদিও কখনও কখনও আমরা বড় প্রাণীদের ক্ষেত্রে বৃটিশ পদ্ধতি অনুসারে ইঞ্চি, ফুটেও প্রকাশ করি কারণ সাধারণভাবে আমরা সেই দৈর্ঘ্যের সাথে বেশী পরিচিত। ক্ষুদ্র এককগুলি কিন্তু মেট্রিক পদ্ধতি অনুসারেই করা হয়। যথা ঃ-

একক	পরিমাপ	যেভাবে লেখা হয়
(i) মাইক্রন/মাইক্রোমিটার	1/1000 মিলিমিটার	1μm
(ii) মিলিমাইক্রন/ন্যানোমিটার	1/1000 মাইক্রন	1nm
(iii) অ্যাংস্ট্রম	1/10 ন্যানোমিটার	1Å

এর চেয়েও দৈর্ঘ্যের ক্ষুদ্র একক আছে কিন্তু প্রাণীবিজ্ঞানে তার প্রয়োজন হয় না। সাধারণভাবে বলা যায় - খালি চোখে দৃশ্যমান বস্তু (Macroscopic); খালি চোখে দৃশ্যমান নয় বা আণুবীক্ষণিক অর্থাৎ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্যমান বস্তু (Microscopic) যাদেরকে শুধুমাত্র সরল বা যৌগিক আলোকঅণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে হয় বা দৃশ্যমান হয়। কিছু জীব আছে বা কোষঅঙ্গানু াছে যারা ঐই যৌগিক আলোক অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও ভাল দৃশ্যমান নয় তাদেরকে দেখতে গেলে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের (Electron microscope) সাহায্য নিতে হয়, তাদের বলে অতিআণুবীক্ষণিক (Submicroscopic/ Ultramicroscopic) বস্তু।

2.3.2 বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রাণীদের আকার

একই গোষ্ঠীভুক্ত প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য। একই সাথে রয়েছে আকৃতিগত সাদৃশ্যও। আবার তার সাথে কখনও বা দেখতে পাওয়া যায় আকারের বিভিন্নতা। এই বিভিন্নতা এত বেশী যে তা সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করা এখানে প্রায় অসম্ভব। সামান্য ধারণা সৃষ্টির জন্য এখানে কিছু আলোচনা

করা হল। আদ্যপ্রাণীরা বেশীরভাগই আণুবীক্ষণিক, লম্বায় সাধারণভাবে 10 - 30 μm, তবে এর থেকেও ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হতে পারে। ম্যালেরিয়া পরজীবীর একটি দশা যা মানুষের রক্তের লোহিত কণিকার ভেতরে থাকে তা কখনও 2-3μm ব্যাস বিশিষ্ট হয়, আবার কিছু খোলক বিশিষ্ট আদ্যপ্রাণীর খোলক প্রায় 15mm লম্বা। ছিদ্রাল প্রাণীরা সাধারণভাবে ছোট তবে খালিচোখে দেখা যায়। Potirion নামে এক ধরণের স্পঞ্জ লম্বায় প্রায় 90-100 সেমি ও চওড়ায় প্রায় 50-60 সেমি হতে দেখা যায়। সাধারণভাবে কেঁচোদের আমরা দেখি 10-15 সেমি লম্বা। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল দেশে এক ধরনের কেঁচো পাওয়া যায় যা কিনা 2 মিটারের উপর লম্বা আর প্রস্থে প্রায় 2.5 সেমি (*Rhinodrilus fafner*), কন্টকত্বক প্রাণীরা সাধারণতঃ খুব একটা বড় হয় না 3-4 সেমি থেকে শুরু করে 25-30 সেমি পর্য্যন্ত হয়। তবে এক ধরনের সমুদ্রশশা (*Synapta maculata*) প্রায় 180 সেমি লম্বা আর ব্যাস হল প্রায় 5 সেমি। সন্ধিপদ প্রাণীদের শক্ত বহিরাবরণ থাকার জন্য তাদের আকার খুব বড় হতে পারে না। এদের মধ্যে অনেক প্রাণী আছে তারা খুবই ক্ষুদ্র, প্রায় 1 মিমি বা তার থেকেও ছোটো, বাস করে মাটিতে। এক ধরনের জাপানী কাঁকড়া (*Macrocheira kaempferi*) তার পা গুলি বিস্তার করলে প্রায় সাড়ে তিন মিটার লম্বা হয়। কম্বোজ পর্ব ভুক্ত প্রাণীরা খুব ক্ষুদ্র হতে পারে, যেমন কিছু শামুক 3-4 মিমি লম্বা, আবার বেশ বড়ও হতে পারে, যেমন অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে প্রাপ্ত এক ধরনের শামুকের (Hemifusus) খোলক প্রায় 45 সেমি লম্বা। ঝিনুক জাতীয় এক ধরনের প্রাণীর (*Tridacna gigas*) খোলক প্রায় 135 সেমি লম্বা পাওয়া গেছে। এক বিশালাকার স্কুইড (giant squid) (*Architeuthis*) পাওয়া গেছে যার মূল দেহ 6 মিটার ও বাহু 10 মিটার অর্থাৎ বাহুসমেত দেহ প্রায় 16 মিটার লম্বা। এই প্রাণীকে বলা যায় অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে সর্ববৃহৎ।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম হল একধরণের ব্যাঙ যা উষ্ম অঞ্চলে পাওয়া যায়, আর বৃহত্তম হল নীল তিমি যা কিনা প্রায় 30 মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। মাছেদের মধ্যে সর্ববৃহৎ হল তিমি হাঙর (Whale shark) যারা প্রায় 17-18 মিটার লম্বা হয়। টিকটিকি জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে সর্ববৃহৎ হল "কোমোডে ড্রাগন।" সাপেদের মধ্যে বড় হল একধরনের অজগর সাপ। বর্তমান পাখীদের মধ্যে বড় হল উটপাখী। স্থলচর স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে উচ্চতায় বড় হল জিরাফ, আর ওজনে বড় হল আফ্রিকার হাতি। অতীতে বাস করা এবং বর্তমানে অবলুপ্ত প্রাণীদের মধ্যে অতিবৃহৎ হল এক ধরনের ডাইনোসরাস (*Diplodocus*) (চিত্র 2.3)।

অনুশীলনী-2

1. এককগুলির নাম করুন

(a) 1/1000 মিমি (b) 1/1,000,000 মিমি (c) 1/10,000,000 মিমি

2. সঠিক শব্দটি নীচে থেকে বেছে নিন

(a) রাইবোজোম হল একটি.....বস্তু।

(b) নিউক্লিয়াস হল একটি .....বস্তু।

(c) মশার ডানা হল একটি .....বস্তু।

[খালি চোখে দৃশ্যমান / আণুবীক্ষণিক / অতি আণুবীক্ষণিক]

3. সবচেয়ে বড় কেঁচো পাওয়া যায় .....মহাদেশের.....দেশে।

4. অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা হল একধরনের.....।

5. প্রাণীদের মধ্যে বৃহত্তম হল.....।

2.4 জীবন ধারণ পদ্ধতি (Life Style)

বিভিন্ন জীবদের ভালভাবে বুঝতে গেলে তার বাইরের ও ভেতরের বৈশিষ্ট্যের সাথে পরিচয় হওয়া দরকার। অসংখ্য রকমের প্রাণীদের মধ্যে আছে নানা প্রকারের জীবনধারণ পদ্ধতি। যেহেতু জীবনযাত্রা বা জীবনধারণ পদ্ধতি কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, যেমন তাদের বাসস্থান, খাদ্য, খাদ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, শ্বসন, রেচন, জনন পদ্ধতি প্রভৃতি। আমরা তাই একটু ভাগ করে এসব প্রসঙ্গ আলোচনা করবো।

2.4.1 শ্বসন ও শ্বাসবায়ু গ্রহণ পদ্ধতি অনুসারে

কাজ করার সামর্থ্যকে বলা হয় শক্তি। দেহের মধ্যে শক্তি আশ্রয় করে থাকে পদার্থকে। যে জৈবিক প্রক্রিয়ায় এই শক্তির মুক্তি ঘটানো হয় এবং তার ফলে শক্তিকে কাজে লাগানো যায় তাকে আমরা বলি শ্বসন। শ্বসন প্রক্রিয়া কখনও মুক্ত অক্সিজেন ছাড়াই হয় তাদেরকে জরায়ুজীবি (Anaerobes) বলে, যেমন দেহের পেশীতে বা অন্ত্রে বসবাসকারী কিছু পরজীবী। আবার অন্যান্য বেশীরভাগ প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য মুক্ত অক্সিজেন ছাড়াই হয় তাদেরকে অবায়ুজীবী (Anaerobes) বলে, যেমন দেহের পেশীতে বা অন্ত্রে বসবাসকারী কিছু পরজীবী। আবার অন্যান্য বেশীরভাগ প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য মুক্ত অক্সিজেন প্রয়োজন এদেরকে বলে বায়ুজীবী (Aerobes)। এই বায়ুজীবীদের আবার দুশ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা - স্থলচর (Terrestrial) যারা বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে আর জলচর (Aquatic) যারা জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে। পোকা মাকড়, স্থলচর শামুক ব্যাঙ, টিকটিকি, সাপ, কুমীর, কচ্ছপ, পাখী, পশু, মানুষ প্রভৃতি এরা সবাই বাতাসের মুক্ত অক্সিজেন শ্বাসবায়ু হিসাবে গ্রহণ করে। আবার জলে বসবাসকারী অসংখ্য অমেরুদণ্ডী প্রাণী, যেমন স্পঞ্জ, হাইড্রা, সাগরকুসুম, চিংড়ি, তারা

মাছ, সমুদ্র শশা প্রভৃতি এবং জলে বসবাসকারী মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে কিছু প্রাণী যেমন-প্রায় সমস্ত রকমের মাছ এবং উভচর প্রাণীদের প্রাথমিক দশা (যেমন ব্যাঙাচি দশা) জল থেকে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে। এখানে একটা কথা একটু পরিষ্কার করে বলে নেওয়া দরকার-অনেক প্রাণীই জলচর অর্থাৎ জলে বাস করে কিন্তু জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন শ্বাসবায়ু হিসাবে গ্রহণ করে না যেমন-জলচর সরিসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং কয়েকপ্রকারের মাছ ও প্রায় সকল প্রকার পূর্ণতা প্রাপ্ত উভচর প্রাণী। ব্যাপারটা আর একটু পরিষ্কার করে বললে দাঁড়ায় - সমস্ত জলচর সাপ, কুমীর, কচ্ছপ, পানকৌড়ি, পেঙ্গুইন পাখী, তিমি, সীল, সিন্ধুঘোটক প্রভৃতি প্রাণী এরা সবাই জলে বাস করলেও বাতাস থেকেই অক্সিজেন গ্রহণ করে।

2.4.2 বাসস্থান অনুসারে

প্রাণীদের বাসস্থান সর্বত্র - জল, স্থল, অন্তরীক্ষ। প্রাণের এই ফল্গুধারা বয়ে গেছে তার বিচিত্র পথে, ভিন্ন থেকে ভিন্নতর স্থানে। এই ভিন্নতা খুবই ব্যাপক। তাই একে কয়েকটি ধাপে আলোচনা করা যাক। প্রাথমিক ভাবে প্রাণীদের ভাগ করা যায় তিনটি গোষ্ঠীতে যথা জলচর, স্থলচর এবং উভচর।

2.4.2.1 বাসস্থান - জল

প্রাণ সৃষ্টির প্রথমভাগে প্রাণীরা জলেই বাস করত। বর্তমানে ভূপৃষ্ঠের তিন ভাগ জল ও একভাগ স্থল। বেশীরভাগ প্রাণী জলেই বাস করে। জল লবণের মাত্রা অনুসারে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা মিষ্টি জল অর্থাৎ লবণ মুক্ত জল, ঈষৎ লবণাক্ত জল ও লবণাক্ত জল।

(a) **মিষ্টি জল** ঃ পুকুর, ডোবা, খাল, বিল, ঝর্ণা, নদী প্রভৃতি জলাশয় যার জল প্রায় লবণহীন। এই রকম জলে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী বাস করে যেমন - জলের কেঁচো, জোঁক, শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া, চিংড়ি, নানা রকমের মাছ (রুই, কাতলা, মৃগেল, পুঁটি, বাটা, মৌরলা, তিলাপিয়া প্রভৃতি) ব্যাঙ ইত্যাদি।

(b) **ঈষৎ লবণাক্ত জল** ঃ নদীর মোহনা অঞ্চলে নদীর জলের সাথে সমুদ্রের জল মিশে যায়, ফলে সেখানে নদীর জল সামান্য লবণাক্ত হয়ে যায়। শুধু তাই নয় সমুদ্রে প্রতিদিন দুবার জোয়ার ও দুবার ভাঁটা হয়। জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল নদীর ভেতর আস্তে আস্তে ঢুকে পরে ফলে জলে লবণের পরিমান বাড়তে থাকে। আবার ভাঁটার সময় সেই জল আবার ধীরে ধীরে নদী থেকে সমুদ্রে চলে যেতে থাকে ফলে লবণের মাত্রাও আস্তে আস্তে কমতে থাকে। কখনও কখনও ভাঁটার শেষ পর্যায়ে ঐ অঞ্চলে জল প্রায় লবণহীন হয়ে যায়। প্রত্যেকবার জোয়ার-ভাঁটার সময় জলে লবণের মাত্রার এই পরিবর্তন মোহনা অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই অঞ্চলে যে সমস্ত প্রাণীরা বাস করে তাদের এই লবণের মাত্রার তারতম্যের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হয়। সব ধরনের জলচর প্রাণীরা এই রকম লবণের মাত্রার পরিবর্তন

সহ্য করতে পারে না। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে বাগদা চিংড়ি, কিছু জাতের কাঁকড়া, ইকিউরাস (*Echiurus*), সাইপানকুলাস (*Sipunculus*) জাতীয় প্রাণী আর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে কয়েক প্রকারের মাছ, যেমন- পারশে, ভাঙ্গর, তপসে, গুরজালী, খরসুলা প্রভৃতি, সরিসৃপদের মধ্যে গোসাপ, কুমীর, আর স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে শুশুক এই অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়।

(c) **লবণাক্ত জল ঃ** সমুদ্রের বিশাল জলরাশি ভীষণ লবণাক্ত। গভীর সমুদ্রের জলে লবণের পরিমাণ প্রায় 3.5% অর্থাৎ 100 মিলি জলে প্রায় 3.5 গ্রাম লবণ গুলে থাকে। এই সমুদ্রে বাস করে প্রায় সমস্ত রকমের প্রাণী, আদ্যপ্রাণী থেকে শুরু করে স্তন্যপায়ী প্রাণী সবাই। এদের মধ্যে আবার কয়েকটি পর্বের প্রাণীরা শুধুমাত্র সমুদ্রেই বাস করে, মিষ্টি জলে তাদের কোন প্রতিনিধি বাস করে না, যেমন পর্ব-টিনোফোরা, পর্ব-একাইনোডারমাটা তার মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য।

2.4.2.1.1 বাসস্থান - জলে অবস্থান অনুসারে

জলে বসবাসকারী প্রাণীদের অবস্থান অনুসারে মুখ্যতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। মুক্ত জলে বসবাসকারী ও তলদেশে বসবাসকারী।

(a) **মুক্ত জলে বসবাসকারী** প্রাণীদের মধ্যে কেউ থাকে জলের উপরতলে ভাসমান অবস্থায়, এদের চলন অঙ্গ নেই আর থাকলেও তার সাহায্যে খুব একটা নড়াচড়া করতে পারে না, এরা প্রধানতঃ জলের স্রোত বা বাতাসের গতি দ্বারা বাহিত হয় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে - এদেরকে বলা হয় প্লাঙ্ক্টন (Plankton)। এই গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে অসংখ্য সবুজ শৈবাল (Phytoplankton) আর অগুন্তি ক্ষুদ্র প্রাণী বা তাদের শূককীট দশা (Larva)। এরা জলে বসবাসকারী বিভিন্ন প্রাণীর খাদ্য। এদের জুপ্লাঙ্ক্টন (Zooplankton) বলে।

যে সব প্রাণীদের সক্রিয়ভাবে জলে নড়াচড়া করতে দেখা যায়, যাদের চলন বায়ু বা জলস্রোতের উপর কেবলমাত্র নির্ভর নয় তাদেরকে বলে নেক্টন (Nekton)। যেমন, মাছ, হাঙর, তিমি ইত্যাদি।

(b) **জলের তলদেশে বসবাসকারী (Benthos) ঃ** অনেক প্রাণী আছে যারা জলের তলদেশে যে মাটি, পাথর, বালি বা কাদা থাকে সেখানে বাস করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় - সাগর কুসুম, সাগর লেখনী, তারা মাছ, সমুদ্র শশা, শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া প্রভৃতি প্রাণীর কথা।

সমুদ্রের ধারে গেলে আপনারা দেখতে পাবেন জল কখনও খুব কাছে চলে এসেছে আবার কখনও বা অনেক দূরে সরে গেছে। ভাঁটার সময় জল দূরে সরে যায় আর সেই সময় সমুদ্রতট (Sea Beach) প্রকাশ হয়ে পড়ে। ভালভাবে লক্ষ করলে দেখতে পাবেন সেই তটে অনেক প্রাণীর অবস্থান। ভাঁটার সময় আমরা সামান্য একটু তলভূমি দেখতে পাই। তার পরেও রয়েছে বহু নীচ পর্যন্ত বিস্তৃত এই সমুদ্র তলভূমি। জলের গভীরতা কোথাও 10 কিলোমিটারেরও বেশী। সমুদ্রের তলদেশ কিন্তু পুকুর বা নদীর

তলদেশের মত সমান নয়, সেখানে রয়েছে অনেক উঁচু-নীচু পাহাড়। এই রকম কিছু পাহাড়ের উচ্চতা মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতার চেয়েও বেশী। সমুদ্রের নীচের এই রকম পরিবেশ আমরা উপর থেকে কিছুই বুঝতে পারি না। প্রায় এই রকম সব গভীরতাতেই প্রাণীদের আবাস।

জলের গভীরতার বৃদ্ধির সাথে সাথে জলের চাপ বাড়তে থাকে আর কমতে থাকে জলের তাপমাত্রা। পরিষ্কার সমুদ্র জলে প্রায় 200 মিটার পর্যন্ত সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে। তার নীচে ক্রমশঃ অন্ধকার আর অন্ধকার। গভীর সমুদ্রে ওই চির অন্ধকারময় প্রচণ্ড চাপযুক্ত পরিবেশে তাপমাত্রা কমতে কমতে নেমে যায় 4ºC তাপমাত্রার জলের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী অর্থাৎ সেই তাপমাত্রার জল সবচেয়ে ভারী। ফলে সেই সব অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রাণীরা বাস করছে এক নির্দ্দিষ্ট পরিবেশে। প্রাণীবিজ্ঞানীদের কাছে সেই সব অঞ্চলের প্রাণীরা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ ওদের পরিবর্তনের বা বিবর্তনের গতি (Rate of Evolution) অনেক কম। ফলে ওই সব অঞ্চলে অনেক প্রাণী পাওয়া যায় যারা বহু প্রাচীন বৈশিষ্ট্য যুক্ত। গভীর সমুদ্রে বসবাসকারী বেশীরভাগ প্রাণীদের চোখ নেই, আবার কোন কোন প্রাণীদের রয়েছে আলো উৎপাদনকারী অঙ্গ (Light Producing Organ)। এই সমস্ত বিচিত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে রয়েছে অসংখ্য প্রাণী সমুদ্রের অতল গভীরে।

2.4.2.2. বাসস্থান - জল ও স্থল

অনুসন্ধান করলে দেখা যায় বেশ কিছু প্রাণী, অমেরুদণ্ডী এবংমেরুদণ্ডী, জল ও স্থল উভয় স্থানেই বসবাস করতে পারে। তারা জল ও বায়ু দু জায়গা থেকেই অক্সিজেন নিতে পারে। প্রাণীজগতে এই ঘটনা বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে একাধিক বার ঘটেছে। চ্যাপ্টাক্রিমি জাতীয় প্রাণীদের (Plalyhelminthes or Flat Worms) মধ্যে প্রথম এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তারপর তা অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যেও লক্ষ করা যায়। যেমন অঙ্গুরীমাল প্রাণী (Annelids), কম্বোজপ্রাণী (Molluscs) এবং সন্ধিপদ প্রাণী (Arthropods)। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে আমরা কিছু মাছ দেখতে পাই যারা এইরকম দু স্থান থেকেই অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে, যেমন কৈ, শিঙ্গি, মাগুর, ল্যাটা, শোল প্রভৃতি। আমরা এও দেখেছি যে ব্যাঙ তার প্রাথমিক ব্যাঙাচি দশায় জলের থেকে আর পূর্ণাঙ্গ দশায় বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে।

এই শ্বাসবায়ু গ্রহণ পদ্ধতির পরিবর্তন অর্থাৎ জলের বদলে বায়ু থেকে অক্সিজেন নেবার পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছিল এই রকম অন্তর্বর্তী প্রাণীদের মধ্য দিয়ে। প্রাণীজগতে এ আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর ফলে স্থলে অবস্থিত প্রচুর খাদ্য ব্যবহার করার সুযোগ পেতে শুরু করল কিছু প্রাণী।

2.4.2.3 বাসস্থান - স্থল

এরপর আমরা দেখতে পাই অসংখ্য প্রাণী জল ছেড়ে পুরোপুরি স্থলে বসবাস করতে শুরু করল কারণ তারা অক্সিজেনের জন্য আর জলের উপর নির্ভর করল না। তাদের শ্বসন অঙ্গ পরিবর্তিত হল বাতাস থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করার জন্য। এই ব্যাপারে অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে সফল

গোষ্ঠী হল ইনসেক্টা (Insecta) অর্থাৎ সাধারণভাবে আমরা যাদের কীট-পতঙ্গ বলি। উড়তে পারার সুবাদে পতঙ্গরা স্থলে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। যদিও অনেক কীটপতঙ্গ এখনও শূককীট ও মূককীট দশায় জলে থাকে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে জল থেকে স্থলে আগমন ঘটেছে। কিছু মাছ (যেমন ফুসফুস মাছ - Lung Fish), উভচর প্রাণী (যেমন ব্যাঙ, স্যালাম্যান্ডার - Salamander)। এই বৈশিষ্ট্য স্থায়ীত্ব লাভ করল সরিসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে। আমরা বর্তমানে স্থলের প্রায় সব জায়গায় দেখতে পাই নানান প্রাণীর বাসস্থান, সমতলভূমি, কিংবা মরুভূমি, জঙ্গল কিংবা পাহাড়ের উঁচু অঞ্চল, সর্বত্রই কোন না কোন প্রাণী বাস করে।

2.4.3 খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি অনুসারে

খাদ্য ছাড়া কোন প্রাণীর জীবন ধারণ সম্ভব নয়। খাদ্যের মধ্যেই রয়েছে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ ও শক্তি। এই খাদ্য গ্রহণ বা সংগ্রহ সব প্রাণী একইভাবে করে না। এর মধ্যে প্রকারভেদ আছে, তা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

2.4.3.1 মুক্তজীবী (Free Living)

যে সমস্ত প্রাণী অন্য কোন নির্দিষ্ট উদ্ভিদ বা প্রাণীর উপরভাগে বা অভ্যন্তরে অবস্থান না করে খাদ্য স্বাধীনভাবে সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে তাদেরকে স্বাধীনজীবী বা মুক্তজীবী বলে। যেমন আমাদের আশেপাশে দেখতে পাই প্রজাপতি, ফড়িং, আরশোলা, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি। এই সব প্রাণীদের মূলতঃ তিন গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়।

(a) নিরামিষাশী (Herbivorous, Herbivore) - যে সকল প্রাণী খাদ্যের জন্য শুধুমাত্র উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল, যেমন - প্রজাপতি, কোনো কোনো শামুক প্রভৃতি।

(b) মাংসাশী (Carnivorous, Carnivor) - যে সমস্ত প্রাণী খাদ্য হিসাবে অন্য প্রাণীকে গ্রহণ করে। যেমন সাপ, ব্যাঙ, টিকটিকি, বাঘ, শিয়াল, সিংহ প্রভৃতি।

(c) উভয়হারী বা সর্বভুক (Omnivorous, Omnivore) - যে সমস্ত প্রাণী খাদ্য হিসাবে উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়কেই ভক্ষণ করে। যেমন—পিঁপড়ে, আরশোলা, মানুষ প্রভৃতি।

2.4.3.2 শবাহারী (Carrion-feeder)

কিছু মাংসাশী প্রাণী আছে যারা নিজেরা শিকার ধরে খায় না, তার বদলে মৃতপ্রাণীর শব ভক্ষণ করে; তাদের শবাহারী বলে। যেমন-শকুন, কাক, হায়না প্রভৃতি। এই সব প্রাণীরা মৃতদেহ খেয়ে পরিবেশকে পরিস্কার রাখতে সাহায্য করে।

2.4.3.3 দুইটি ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত প্রাণীর একত্রে অবস্থান (Association of Two Different Species)

অনেক সময় দেখা যায় দুটি ভিন্ন প্রজাতি একত্রে অবস্থান করছে এবং খাদ্যের ব্যাপারে একটু নির্ভরশীলতা জন্মেছে। এই নির্ভরশীলতার মাত্রার উপর নির্ভর করে কয়েকটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়, যেমন-

(a) সহভোক্তা (Commensal) - যখন দুইটি প্রজাতি একস্থানে অবস্থান করে খাবার ভাগ করে খায়, যেমন একটা মৃত শামুকের খোলকের বাইরে অবস্থানরত সাগরকুসুম আর খোলকের ভেতরে অবস্থান রত সন্ন্যাসী কাঁকড়ার সহাবস্থান। এক্ষেত্রে সন্ন্যাসী কাঁকড়া যে খাবার খায় তার কিছু টুকরো খাবার সাগর কুসুম পেয়ে যায়। আমাদের অন্ত্রের মধ্যে বেশ কিছু ব্যাকটেরিয়া বাস করে যারা আমাদের খাদ্যের কিছু অগৃহীত অংশ খেয়ে নেয়, এরাও এই গোষ্ঠীভুক্ত। এই ব্যাকটেরিয়া অবশ্য কোন ক্ষতি করে না। সহভোক্তাদের অবস্থান মাত্রাভেদে Commensalism ছাড়া Mutualism বলেও উল্লেখ হয়।

(b) ব্যতিহারী (Symbionts) - যখন দুইটি প্রজাতি একত্রে পরস্পরের উপর নির্ভর করে বেঁচে তাকে, দুজনই দুজনের উপকার করে এই রকম জোটকে ব্যতিহারী বলে। যেমন শিম্বী জাতীয় উদ্ভিদের মূলে অবস্থানরত রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া, কিংবা নিরামিষাশী প্রাণী (যেমন, গরু, ছাগল প্রভৃতি) - দের পাকস্থলী বা অন্ত্রে বসবাসকারী কিছু ফ্ল্যাজেলাযুক্ত আদ্যপ্রাণী, অথবা উইপোকার পাকস্থলীর মধ্যে অবস্থিত কিছু ফ্লাজেলাযুক্ত আদ্যপ্রাণী। রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বিনিময়ে উদ্ভিদকে নাইট্রোজেনযুক্ত যৌগ সরবরাহ করে। আবার এই ফ্লাজেলাযুক্ত আদ্যপ্রাণী তৃণভোজী প্রাণীদের বা উইপোকার খাদ্য কাঠের সেলুলোজ পরিপাকে সাহায্য করে এবং উভয়ই উপকৃত হয়। কারণ ওইসব প্রাণীরা সেলুলোজ ভঙ্গকারী উৎসেচক নিজেরা তৈরী করতে পারে না। এইভাবে একে অপরের উপকার করে বেঁচে থাকে।

(c) পরজীবীতা (Parasitism) - যখন দুটি ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত প্রাণী একত্রে এমনভাবে অবস্থান করে যে তার মধ্যে একটি প্রাণী (পরজীবী) খাদ্য ও অন্যান্য সুবিধা নিয়ে এমনভাবে জীবন ধারণ করে যাতে অন্য প্রাণীটির (পোষক প্রাণী) ক্ষতি হয়। পরজীবী দু'প্রকারের হতে পারে, যথা - পূর্ণ এবং আংশিক পরজীবী।

আংশিক পরজীবী হল যারা মাজে মাঝে খাদ্যের জন্য অন্য প্রাণীর উপর নির্ভর করে, যেমন মশকী। সাধারণতঃ স্ত্রী এবং পুরুষ মশা গাছের রস পান করে বেঁচে থাকে, কিন্তু ডিম পূর্ণতা প্রাপ্তির সময় (during maturation of egg) স্ত্রী মশার প্রয়োজন হয় মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্ত, তাই তারা তখন রক্তপান করতে আসে। অর্থাৎ এরা সাধারণভাবে স্বাধীনজীবী কিন্তু কখনও এরা অল্প সময়ের জন্য পরজীবী হয়ে যায়।

পূর্ণ পরজীবী হল সেই সব পরজীবী যাদের কোন স্বাধীনজীবী অস্তিত্ব নেই, যারা সবসময়ই পরজীবী।

এদের আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা -বহিঃ ও অন্তঃ পরজীবী। বহিঃপরজীবী যারা দেহের বাইরে থাকে, যেমন - উকুন, এঁটুলি, আর অন্তঃপরজীবী যারা দেহের ভেতরে থাকে, যেমন-ম্যালেরিয়া পরজীবী, কালাজ্বর পরজীবী প্রভৃতি; এরা কোন সময়ই মুক্তজীবী হয় না।

2.4.4 রেচন পদ্ধতি অনুসারে

প্রত্যেক সজীব দেহকোষে নানা জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে চলেছে। তার মধ্যে কতগুলি বিক্রিয়া গঠনমূলক আবার কিছু বিক্রিয়া ভাঙনমূলক। ভাঙনমূলক বিক্রিয়ায় এমন কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয় যা দেহের কাজে লাগে না এবং অতিরিক্ত সঞ্চিত হলে দেহের পক্ষে হানিকর। তাই সেই সব হানিকর পদার্থ দেহের বাইরে বার করে দেওয়া দরকার। শর্করা ও চর্বি জাতীয় পদার্থ ভাঙলে পরে তা থেকে উৎপন্ন হয় জল ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2)। এই CO_2 দেহতল, ফুলকা, ফুসফুস প্রভৃতি শ্বাসঅঙ্গের মাধ্যমে দেহের বাইরে বেরিয়ে যায়।

প্রোটিন জাতীয় পদার্থের ভাঙনের শেষে উৎপন্ন হয় মূলতঃ CO_2 এবং অ্যামোনিয়া। এদের মধ্যে অ্যামোনিয়া (NH_3) বেশী ক্ষতিকারক দেহের পক্ষে। অ্যামোনিয়া দ্রুত জলে দ্রবীভূত হয়ে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্স্াইড গঠন করে যা কিনা ক্ষারীয়। ফলে রক্ত বা কলা রসের অম্লত্ব-ক্ষারত্ব-এর সাম্যতা নষ্ট হয় যা কিনা কোষের পক্ষে ক্ষতিকারক। তাই খুব দ্রুত অ্যামোনিয়াকে দেহের বাইরে পাঠানো দরকার। জলের প্রাপ্তি অনুসারে প্রাণীরা তিনভাবে এই বর্জ্য পদার্থ দেহের বাইরে নিষ্ক্রান্ত করে আর সেই অনুযায়ী প্রাণীদের তিনভাগে ভাগ করা হয়।

(a) অ্যামোনিয়া নিষ্ক্রান্তকারী প্রাণী (Ammonotelic) - যে সব প্রাণীরা সরাসরি অ্যামোনিয়া দেহের বাইরে নিষ্ক্রান্ত করে, যেমন - চোয়াল বিহীন প্রাণী (Cyclostomes) এবং অস্থিযুক্ত মাছ (Teleost fish)। এরা প্রচুর জল পায় তাই জলে দ্রবীভূত করে অ্যামোনিয়া দেহের বাইরে বার করে দেয়।

(b) ইউরিয়া নিষ্ক্রান্তকারী প্রাণী (Uricotelic) - যে সব প্রাণীরা অ্যামোনিয়াকে অপেক্ষাকৃত কম দ্রবণীয় ইউরিয়ায় রূপান্তর করে দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত করে। যেমন - তরুণাস্থিযুক্ত মাছ, উভচর প্রাণী এবং স্তন্যপায়ী প্রাণী।

(c) ইউরিক অ্যাসিড নিষ্ক্রান্তকারী প্রাণী (Uricotelic) - যে সব প্রাণীরা নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ প্রায় কঠিন অবস্থায় ইউরিক অ্যাসিড দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত করে। যেমন - সরিসৃপ ও পাখী।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বর্জ্য পদার্থ কি হবে তা কিছুটা নির্ভর করছে জল কতটা পাওয়া যায় তার উপর। জলের সাশ্রয় ও সঞ্চয় করবার জন্য প্রাণীরা বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলার এ এক অন্যতম অভিযোজন।

2.4.5 জনন পদ্ধতি অনুসারে

জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল জনন। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীব অপত্য সৃষ্টি করে জীবনের ধারা অব্যাহত রাখে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে। এই জনন প্রক্রিয়া প্রাণীজগতে বিভিন্ন রকম ভাবে সংগঠিত হয়। সাধারণভাবে একে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা - অযৌন জনন ও যৌন জনন।

2.4.5.1 অযৌন জনন (Asexual Reproduction)

এই জনন প্রক্রিয়ায় কোন বিশেষ জনন অঙ্গ ছাড়া কেবলমাত্র একটি প্রাণী থেকেই নতুন অপত্যের সৃষ্টি হয়। সেইজন্য এই ধরনের জননকে কখনও "একটি ব্যক্তির অপত্য" (Uniparental Generation) বলে। প্রাণীজগতে এই প্রক্রিয়া প্রাচীন এবং এই প্রক্রিয়া প্রধানতঃ দেখা যায় নিম্নশ্রেণীর প্রাণীগোষ্ঠীর মধ্যে। অযৌন জনন প্রক্রিয়াকে পাঁচ ভাগ ভাগ করা হয়েছে। যথা - দ্বি-বিভাজন, বহু বিভাজন, কোরকোদ্‌গম, খণ্ডিভবন ও পুনরুৎপাদন। (চিত্র 2.4)।

2.4.5.1.1 দ্বিবিভাজন (Binary Fission)

যখন একটি দেহ খন্ডিত হয়ে দুটি প্রাণীর সৃষ্টি হয় তখন তাকে দ্বিবিভাজন বলে। এই ধরনের জনন কিছু এককোষী আদ্যপ্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়, যেমন - অ্যামিবা, এন্টামিবা, প্যারামেসিয়াম প্রভৃতি। এই প্রক্রিয়ায় প্রথমে নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয় তারপর সাইটোপ্লাজম বিভাজিত হয়ে দুটি প্রাণীর সৃষ্টি হয়। বিভাজনের পরে অপত্য প্রাণীদুটি আকারে অর্দ্ধেক হয়ে যায়, তারপর বৃদ্ধির ফলে আবার প্রাথমিক আকারে পৌঁছে যায়।

2.4.5.1.2 বহুবিভাজন (Multiple Fission)

এই প্রক্রিয়ায় একটি দেহের নিউক্লিয়াস অনেকবার পরপর বিভাজিত হওয়ার পর বহু সাইটোপ্লাজমের বিভাজন ঘটে ফলে অনেক অপত্যের সৃষ্টি হয়। ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবন চক্রে মানুষ এবং মশকী উভয় পোষক দেহেই বহুবিভাজন দেখা যায়।

2.4.5.1.3 কোরকোদ্‌গম (Budding)

এই প্রক্রিয়ায় একটি প্রাণীর দেহ থেকে একটি ছোট কোরক সৃষ্টি হয়ে তারপর তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রাথমিক আকার ও আকৃতি বিশিষ্ট হয়। কখনও কখনও এইভাবে বারবার কোরকোদ্‌গম হবার ফলে অসংখ্য প্রাণীর একটা দল (Colony) তৈরী হয়। পর্ব-পরিফেরা, নিডারিয়া প্রভৃতি গোষ্ঠীভুক্ত প্রাণীদের মধ্যে এবং কোন কোন আদ্যপ্রাণীতে এইরকম জনন দেখা যায়।

2.4.5.1.4 খণ্ডীভবন (Fragmentation)

কোন কোন চ্যাপ্টা ক্রিমি জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় যে একটি দেহ তিন-চারটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে তার প্রতি খণ্ড থেকে আবার পূর্ণ প্রাণীর সৃষ্টি হয়, একে খণ্ডীভবন বলে।

2.4.5.1.5 পুনরুৎপাদন (Regeneration)

দেহের কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা নষ্ট হলে কিছু প্রাণী সেই হারানো অংশ আবার তৈরী করে নিতে পারে। এই ক্ষমতা বিভিন্ন প্রাণী গোষ্ঠীতে দেখা যায়, যেমন - পর্ব নিডারিয়া, চ্যাপ্টাক্রিমি, পর্ব একাইনোডারমাটা, শ্রেণী অ্যাম্ফিবিয়া। পুনরুৎপাদন যদিও একটি সাধারণ প্রক্রিয়া নয় তথাপি এই ক্ষমতা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জনন প্রক্রিয়া হিসাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

2.4.5.2 যৌন জনন (Sexual Reproduction)

যে ক্ষেত্রে কোন বিশেষ অঙ্গ থেকে উৎপন্ন বিশেষ ধরনের জনন কোষ (Gametes) থেকে অপত্য প্রাণীর সৃষ্টি হয় তাকে যৌন জনন বলে। এক্ষেত্রে সাধারণতঃ দুটো ভিন্ন দেহ থেকে জননকোষ উৎপন্ন হয়ে জনন হয় বলে একে "দ্বিদেহ জাত জনন' (Biparental Generation) বলে। সমস্ত উন্নত প্রাণীদের এরূপ জনন দেখা যায়। যেমন- কেঁচো, প্রজাপতি, শামুক থেকে শুরু করে স্তন্যপায়ী প্রাণী পর্য্যন্ত প্রায় সবাই যৌন জনন সম্পন্ন করে। যৌন জনন যদিও উন্নত প্রকৃতির তবুও এই জনন পদ্ধতি আদ্যপ্রাণী অর্থাৎ প্রোটোজোয়া গোষ্ঠীভুক্ত প্রাণীদের মধ্যেও দেখা যায়, যেমন ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবনচক্রে যৌন জনন দেখা যায় এবং তার প্রধান পর্যায় মশকীর দেহে সংঘটিত হয়।

এই জনন-প্রক্রিয়ায় সাধারণতঃ দুই ধরনের জননকোষ তৈরী হয় এবং তাদের আকার ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, সম জনন, অসম জনন ও বিষম জনন (চিত্র 2.5)

(a) সম জনন (Isogamy) - যখন দুধরনের জনন কোষ আকৃতি ও আকারে সমান, যেমন - একধরনের আদ্যপ্রাণী মনোসিস্‌টিস (*Monocystis*)।

(b) অসম জনন (Anisogamy) - যখন দুধরনের জনন কোষের আকার সমান কিন্তু আকৃতি ভিন্ন অর্থাৎ চেহারায় একই রকম দেখতে শুধু এক ধরনের জনন কোষ অন্যগুলোর চেয়ে ছোট। যেমন - আদ্যপ্রাণী ক্লামাইডোমোনাস।

(c) বিষম জনন (Oogamy) - যখন দুধরনের জনন কোষ আকার, আকৃতি ও প্রকৃতিতে ভিন্ন, একধরনের জননকোষ আকারে সাধারণতঃ বলের মত, অপেক্ষাকৃত বড় ও নিশ্চল, এদেরকে বলে স্ত্রী জননকোষ বা বড় জনন কোষ (Female Gamete or Macrogamete); আর অন্য ধরনের জনন কোষ আকারে ছোট, ফ্যাজেলামযুক্ত, সচল, সরু ও লম্বাটে গড়ন, এদেরকে বলে পুং জননকোষ বা ক্ষুদ্র জনন

কোষ (Male Gamete or Microgamete), এই দুই ভিন্ন প্রকার জননকোষের সাহায্যে জনন সম্পন্ন হয়। এই প্রকার জনন আদ্যপ্রাণী (Protozoa) থেকে শুরু করে মানুষ পর্য্যন্ত প্রায় সব প্রাণী গোষ্ঠীতেই দেখা যায়।

2.4.5.2.1 সংযুক্তি (Conjugation)

এ এক বিশেষ প্রক্রিয়া যা কিনা নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়। যেমন প্যারামেসিয়াম (Paramecium), এখানে তাদের ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস (Micronucleus) এর অংশের বিনিময় ঘটে পাশাপাশি লেগে থাকা দুটো প্রাণীদ্বয়ের মধ্যে, তারপর জোট খুলে যায় এবং প্রতি প্রাণী থেকে চারটে করে ক্ষুদ্র প্রাণীর সৃষ্টি হয়। পরে আরো সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে।

2.4.5.2.2 অপুংজনি (Parthenogenesis)

এই বিশেষ জনন প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ধর্মী জনন কোষের মিলন ছাড়াই, অর্থাৎ নিষেক ছাড়া, শুধু ডিম্বাণু বা স্ত্রী জনন কোষ থেকেই পূর্ণ প্রাণীর সৃষ্টি হয়। পিঁপড়ে, মৌমাছি, বোলতা প্রভৃতি অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে এই ধরনের জনন দেখা যায়। রানী মৌমাছির অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে তৈরী হয় পুরুষ মৌমাছি বা ড্রোন (Drone)। পরীক্ষা করে দেখা গেছে কিছু নিম্নশ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের, যেমন ব্যাঙ, স্যালামাণ্ডার (এক ধরনের উভচর প্রাণী) বা কিছু টিকটিকির পরিণত ডিম্বাণুতে কৃত্রিমভাবে উদ্দীপিত করে, নিষেক ছাড়াই, নতুন অপত্য প্রাণীর সৃষ্টি করা যায়।

2.4.5.2.3 বহুভ্রূণতা (Polyembryony)

একটি পরিণত ডিম্বাণু থেকে একাধিক প্রাণীর সৃষ্টি হওয়াকে বহুভ্রূণতা বলে। মানুষের ক্ষেত্রে সমআকৃতি বিশিষ্ট যমজ ভাই বা বোন এই ভাবে সৃষ্টি হয়। কিছু বজ্রকীটের (Armadillo) একটি ডিম্বাণু থেকে চারটে পর্য্যন্ত বাচ্চা হয়। পর্ব ব্রায়োজোয়া (Bryozoa) এবং পতঙ্গ শ্রেণীর হাইমেনপ্টেরা বর্ণের কিছু প্রাণীদের মধ্যে বহুভ্রূণতা প্রায়ই দেখা যায়।

2.4.6 ভ্রূণাণুর পরিস্ফুটন পদ্ধতি অনুসারে

সাধারণভাবে বলা যায় নিষিক্ত ডিম্বাণু যাকে ভ্রূণাণুও বলা হয়ে থাকে (Zygote), সেই হল অপত্য প্রাণীর শুরু। তারপর হয় তার পরিস্ফুটন। এই পরিস্ফুটন তিন ভাবে ঘটে প্রাণীর পূর্ণতা প্রাপ্তি হতে পারে। যথা - অণ্ডজ, জরায়ুজ ও অণ্ড-জরায়ুজ।

(a) অণ্ডজ - যে সব প্রাণীর প্রাথমিক পরিস্ফুটন ডিমের মধ্যে ঘটে, যেমন - কীট, পতঙ্গ, মাছ, উভচর, সরিসৃপ ও পাখী।

(b) জরায়ুজ - যে সব প্রাণীর প্রাথমিক পরিস্ফুটন মায়ের দেহের ভিতর জরায়ুর (Uterus) মধ্যে ঘটে। সেই সময় প্রাথমিকভাবে পুষ্টি সামগ্রী মায়ের দেহ থেকে সংগ্রহ করে অপত্য বড় হয়। যেমন- গরু, ছাগল, বিড়াল, কুকুর, মানুষ প্রভৃতি অর্থাৎ প্রায় সব স্তন্যপায়ী প্রাণী।

(c) অণ্ড-জরায়ুজ - যে সব প্রাণীর প্রাথমিক পরিস্ফুটন ডিমের মধ্যেই ঘটে কিন্তু সেই ডিম মায়ের দেহের মধ্যেই থাকে, পরিস্ফুটন শেষ হলে তারপর বাচ্চা বাইরে বেড়িয়ে আসে। যেমন - চন্দ্রবোড়া সাপ, ঝুমঝুমি সাপ (Rattle-Snake), সামুদ্রিক সাপ, হাঙর ও কিছু পতঙ্গের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এদের ডিম প্রচুর কুসুমযুক্ত আর তার পরিস্ফুটন ডিম্বনালীর মধ্যেই ঘটে।

2.4.7 জীবনচক্র অনুসারে

সমস্ত প্রাণীর জীবনচক্র একই রকম নয়। ডিম্বাণু (নিষিক্ত বা অনিষিক্ত) থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রাণী সৃষ্টি কখনও বা হয় সরাসরি (Direct) কখনও বা হয় ঘুরপথে (Indirect)।

(a) **সরাসরি পরিস্ফুটন (Direct Development)** মানুষের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল তা দেখতে প্রায় পূর্ণাঙ্গ মানুষের মত শুধুমাত্র আকারে ছোট, তারপর খাওয়া দাওয়া করে সে আস্তে আস্তে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। এই ধরণের পরিস্ফুটনকে আমরা বলে থাকি সরাসরি পরিস্ফুটন। এইরকম আরও উদাহরণ আমরা দেখতে পাই সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে; যেমন - মাছ, টিকটিকি, সাপ, পাখী, স্তন্যপায়ী প্রাণী প্রভৃতি। (চিত্র- 2.6a)।

(b) **ঘুরপথে পরিস্ফুটন (Indirect Development) -** অনেক প্রাণী পূর্ণদশা প্রাপ্ত হবার আগে অন্য দশা অতিক্রম করে আসে এই ধরনের পরিস্ফুটনকে ঘুরপথে পরিস্ফুটন বলে। যেমন একটা স্ত্রী মশা ডিম পাড়ার পর তা থেকে শূককীট (Larva), মূককীট (Pupa) দশা অতিক্রম করে অপত্য মশা পূর্ণাঙ্গ দশা প্রাপ্ত হয়। এরুপে অনেক অঙ্গুরীমাল প্রাণী, কম্বোজ ও কন্টকত্বক পর্বভুক্ত প্রাণী শূককীট (Larva), দশা ও মূককীট (Pupa) দশা পার হয়ে পূর্ণাঙ্গ দশাপ্রাপ্ত হয়। (চিত্র 2.6b)।

2.4.7.1 জনুক্রম (Alternation of Generation)

কিছুপ্রাণীর জীবনচক্রে দুটো দশায় জনন সম্পন্ন হতে দেখা যায়, একবার অযৌন জনন প্রক্রিয়ায় তারপর যৌন জনন প্রক্রিয়ায় পর্যায়ক্রমে জনন কার্য সম্পন্ন হয়। এইভাবে একবার অযৌন জনন ও তারপর যৌন জনন সম্পন্ন হওয়াকে জনুক্রম বলে। অন্যান্য প্রাণীসহ নিডারিয়া পর্বভুক্ত কিছু প্রাণীতে এই ঘটনা পরিলক্ষিত হয়।

অনুশীলনী-3

1. নিম্নলিখিত প্রাণীগুলির মধ্যে যারা শ্বাসবায়ু হিসাবে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে না তাদের চিহ্নিত করুন।

   (a) তারামাছ (b) ব্যাঙ (c) স্পঞ্জ (d) তিমি (e) ব্যাঙাচি (f) মশার শুককীট (g) পেঙ্গুইন (h) হাঙর (i) সাগর কুসুম (j) রুই মাছ (k) কচ্ছপ (l) উড়ুক্কু মাছ

2. শুধুমাত্র সমুদ্রে বাস করে এমন প্রধান দুটি পর্বের নাম করুন।
3. সমুদ্রের তলদেশে জলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত?
4. মিষ্টি জলের মাছ কোন নাইট্রোজেন জাতীয় পদার্থ রেচিত করে?
5. স্তন্যপায়ী প্রাণীর রেচনজাত পদার্থ কী?

2.5 সারাংশ

বিভিন্ন প্রাণীর সামগ্রিক চরিত্র জানতে গেলে এবং বিভিন্ন প্রাণী গোষ্ঠীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করতে হলে তাদের সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য জানা দরকার। সেই তথ্যগুলি কি কি এবং তা কোন কোন মূল বিষয় সম্বন্ধীয় এই এককে তা আলোচনা করা হয়েছে। যে যে বিষয়গুলো আলোচনা হয়েছে তা একটু পর্যালোচনা করা যাক্। এই এককটি পাঠ করে আপনারা জানতে পেরেছেন।

- প্রতিসমতা কাকে বলে, কয় প্রকার ও কি কি?
- প্রাণীদের আকার, আকৃতি বর্ণনা করার কয়েকটি দৃশ্যকোণ এর সম্বন্ধে ধারণা।
- বিভেদ রেখা ও বিভেদতল সম্বন্ধে ধারণা।
- দৈর্ঘ্যের পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত কয়েকটি ক্ষুদ্র একক।
- বিভিন্ন প্রাণী গোষ্ঠীর আকার সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা।
- প্রাণীদের শ্বসন এবং শ্বাসবায়ু সংগ্রহ অনুযায়ী প্রকারভেদ।
- বাসস্থান অনুযায়ী প্রকারভেদ।
- বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও পুষ্টি পদ্ধতি।
- রেচন পদার্থ ও পদ্ধতির প্রকারভেদ।
- দুইটি আলাদা প্রজাতির প্রাণীর জোট বাঁধার বিভিন্ন ধরন।
- বিভিন্ন জনন পদ্ধতি।
- প্রাণীজগতে পরিস্ফুটনের বিভিন্ন ধারা।

2.6 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1. প্রতিসমতা কাকে বলে?
2. বিভিন্নপ্রকার প্রতিসমতা উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।
3. লবণের মাত্রা অনুযায়ী জলচর প্রাণীদের বাসস্থানের শ্রেণীবিভাগ করুন এবং উদাহরণ দিন।
4. মুক্ত জলে বসবাসকারী প্রাণীদের কয় ভাগে ভাগ করা হয়? কি কি? উদাহরণ সহ বুঝিয়ে দিন।
5. গভীর সমুদ্রের পরিবেশ সংক্ষেপে বলুন।
6. দুটি ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত প্রাণীর একত্র অবস্থান সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখুন।
7. রেচন পদার্থ অনুসারে প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ করুন।
8. অযৌন জনন কাকে বলে? কয় প্রকার ও কি কি?
9. বিষম জনন কি? বুঝিয়ে দিন।
10. অণ্ডজ. জরায়ুজ এবং অণ্ডজরায়ুজ কাকে বলে? বুঝিয়ে দিন।

2.7 উত্তরমালা

অনুশীলনী- 1

1. দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসম - b,c,h,i
   অরীয় প্রতিসম - a,d,e,g
   দ্বি-অরীয় প্রতিসম - f,j
   অপ্রতিসম - k
2. অনুদৈর্ঘ্য

অনুশীলনী- 2

1. (a) মাইক্রন, (b) মিলিমাইক্রন/ন্যানোমিটার (c) আংস্ট্রম
2. (a) অতি আণুবীক্ষণিক (b) আণুবীক্ষণিক (c) খালি চোখে দৃশ্যমান
3. দক্ষিণ আমেরিকা, ব্রাজিল।
4. স্কুইড।
5. নীল তিমি।

অনুশীলনী- 3

1. b,d,f,g,k
2. পর্ব টিনোফোরা এবং একইনোডার্মাটা
3. 4° সে (4°C)
4. অ্যামোনিয়া
5. ইউরিয়া

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1. 2.2 দেখুন
2. 2.2.1, 2.2.2 ও 2.2.3 দেখুন
3. 2.4.2.1. দেখুন
4. 2.4.2.1.1 a দেখুন
5. 2.4.2.1.1.b এর শেষাংশ দেখুন
6. 2.4.3.3 দেখুন
7. 2.4.4.a, b ও c দেখুন
8. 2.4.5.1 দেখুন
9. 2.4.5.2. c দেখুন
10. 2.4.6 a, b, c দেখুন

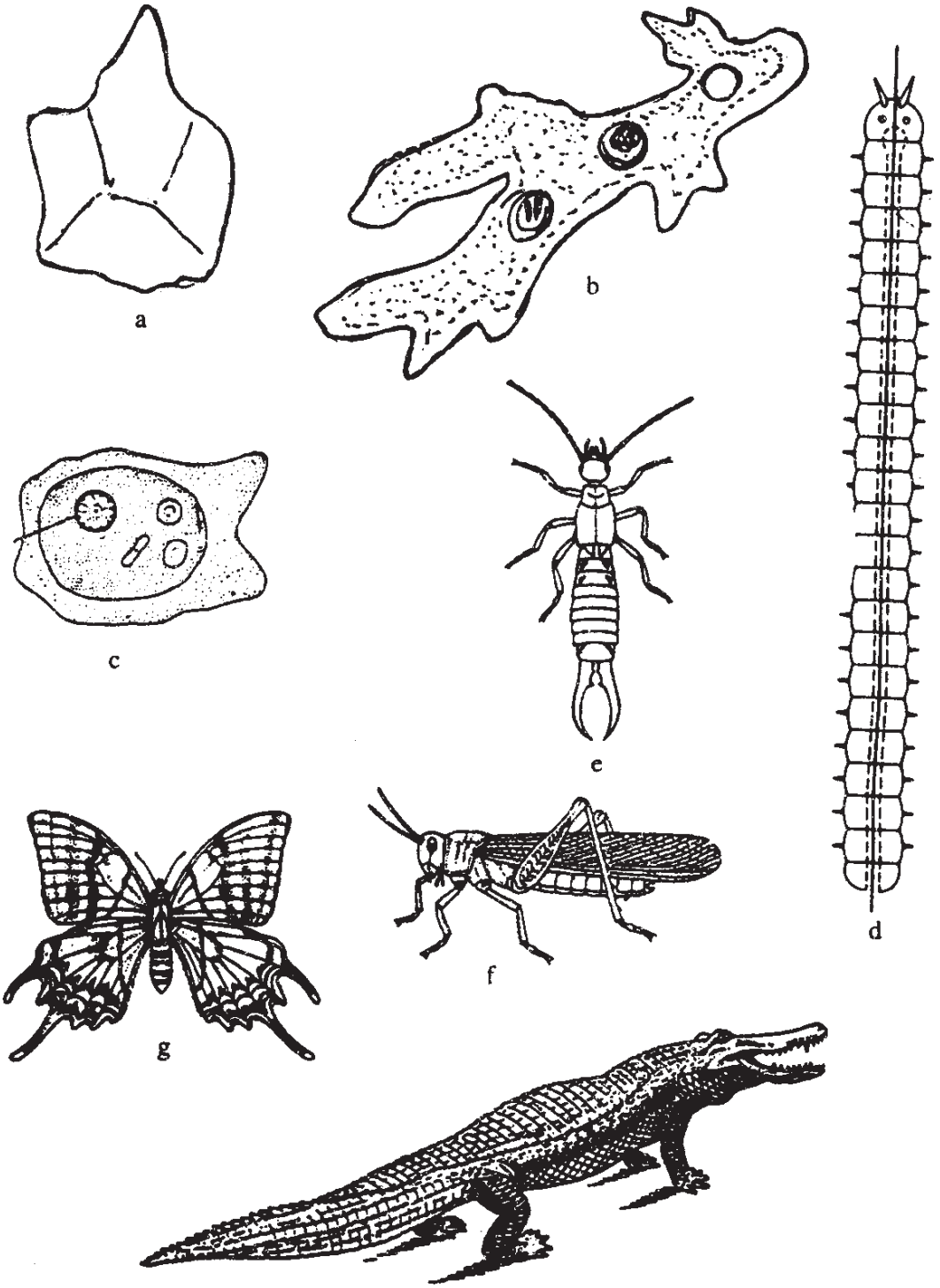
a
b
c
d
e
f
g

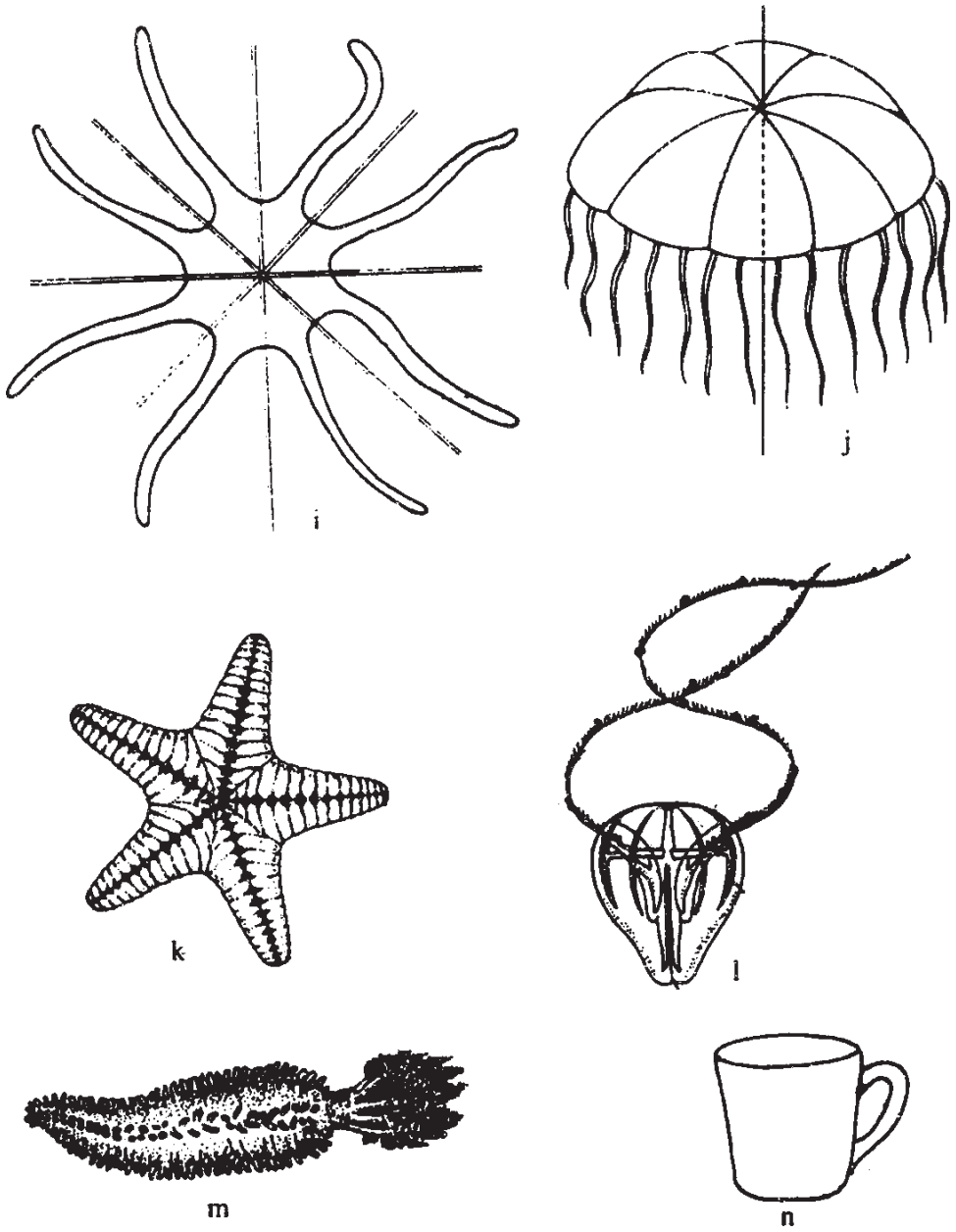

চিত্র নং 2.1 ঃ a-c অপ্রতিসম; (a) পাথরের টুকরো, (b) অ্যামিবা, (c) এন্টামিবা; (d) দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসমতা বোঝানো হয়েছে; (c)-(h) কয়েকটি দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম প্রাণী; (i) অরীয় প্রতিসমতা বোঝানো হয়েছে; (j)-(k) কয়েকটি অরীয় প্রতিসম প্রাণী, (j) জেলিফিস, (k) তারামাছ, (m) সমুদ্র শশা; (n) দ্বি-অরীয় প্রতিসম, চায়ের পেয়ালা, (l) হর্মিফোরা (পর্ব টিনোফোরো) একটি দ্বি-অরীয় প্রতিসম প্রাণী।

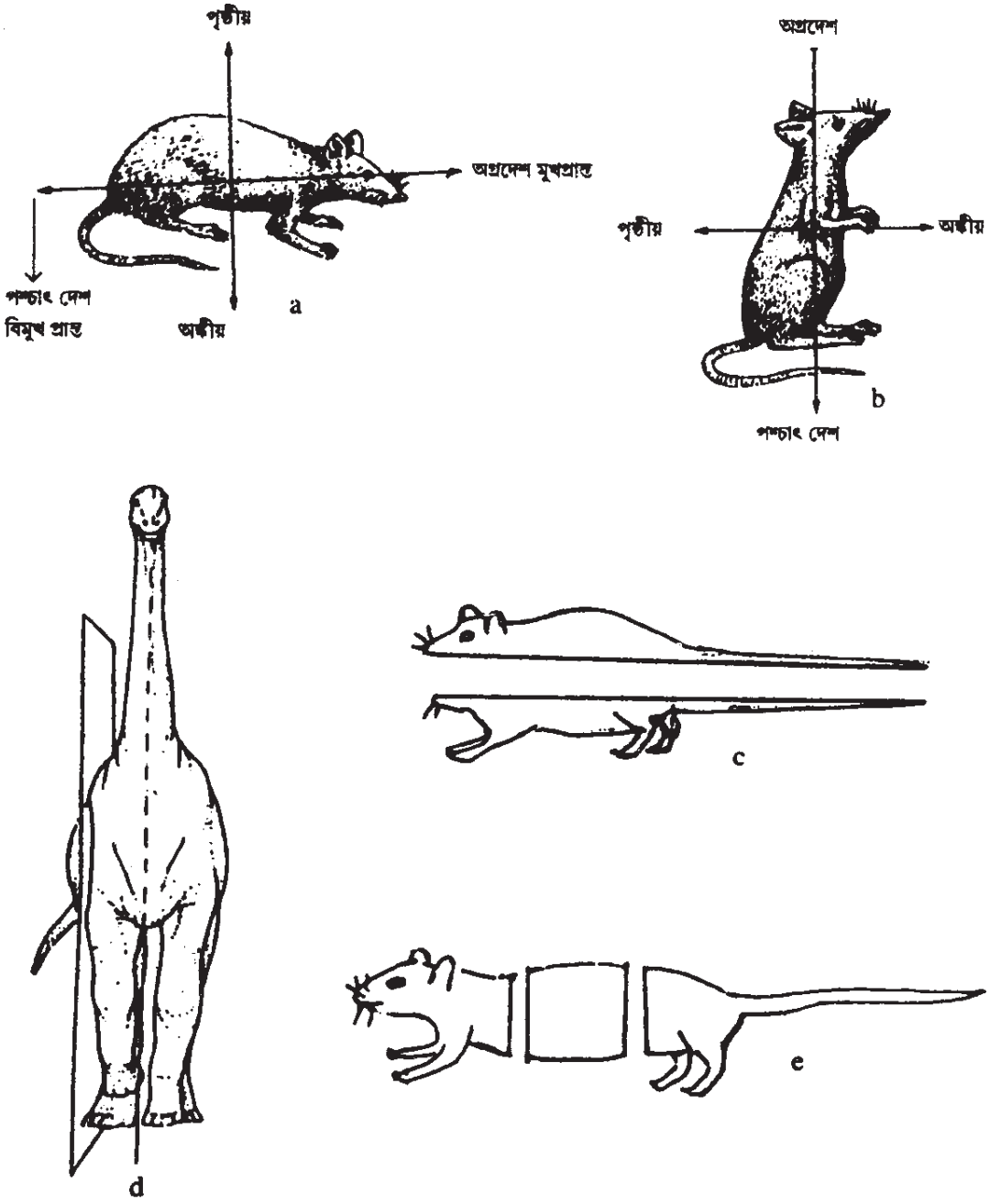

চিত্র নং 2.2 ঃ a-b বিভিন্ন দৃশ্য কোণ ; c-e বিভিন্ন বিভেদ তল;
c-সম্মুখদেশীয় তল, d-পার্শ্বদেশীয় তল, e-অনুপ্রস্থ তল।

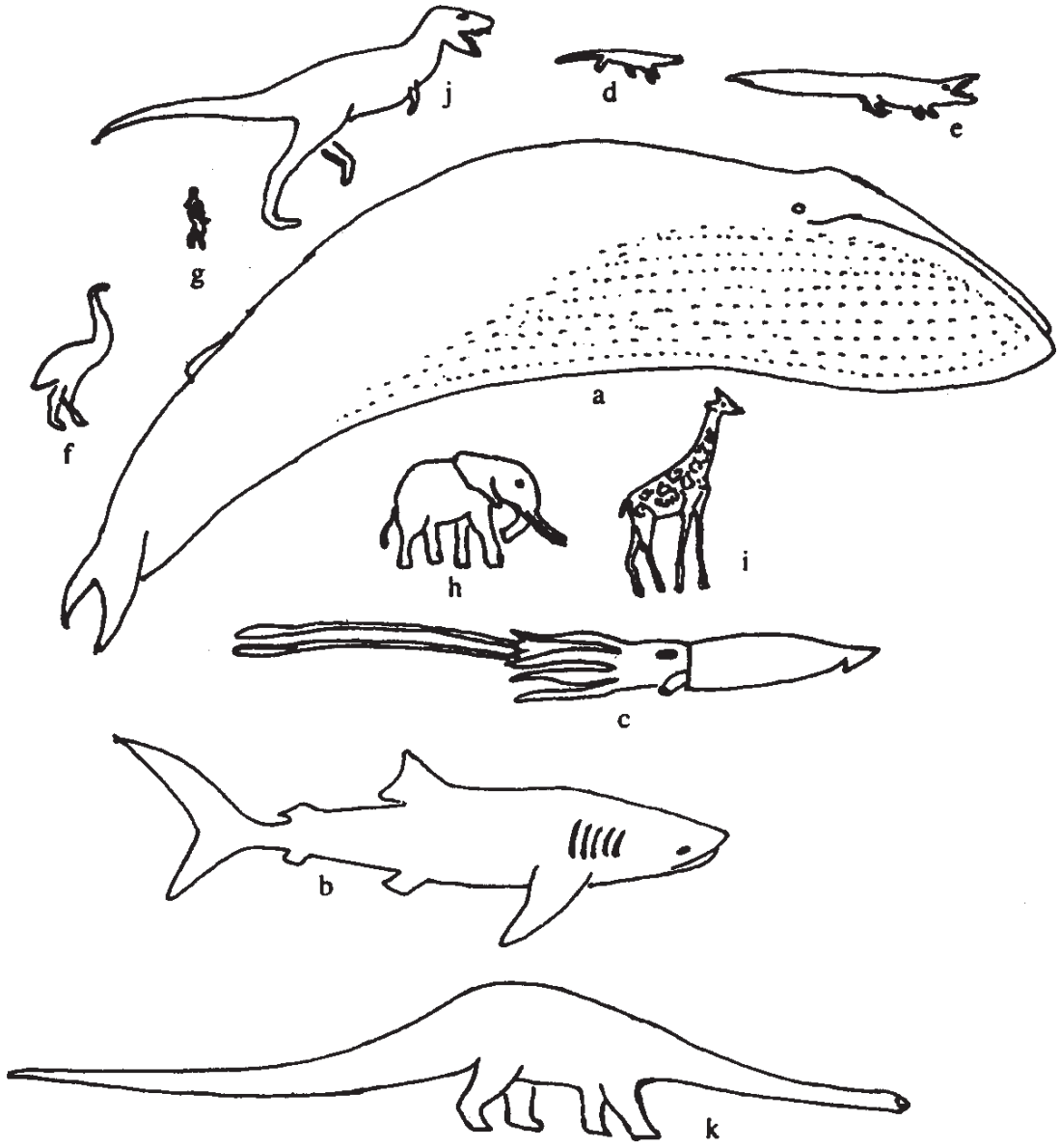

চিত্র নং 2.3 ঃ কয়েকটি প্রাণীর তুলনামূলক আকার। a-নীল তিমি, b-তিমি হাঙর, সবেচেয়ে বড় মাছ; c- বিশালাকার স্কুইড d- কোমোডো ড্রাগন, e- নোনা জলের কুমীর, f- উট পাখী, g- মানুষ, h- আফ্রিকার হাতী, i- জিরাফ, j-অবলুপ্ত সরীসৃপ-টাইরানোসরাস , k-ডিপ্লোডোকাস-একটি অতি বৃহৎ অবলুপ্ত প্রাণী।

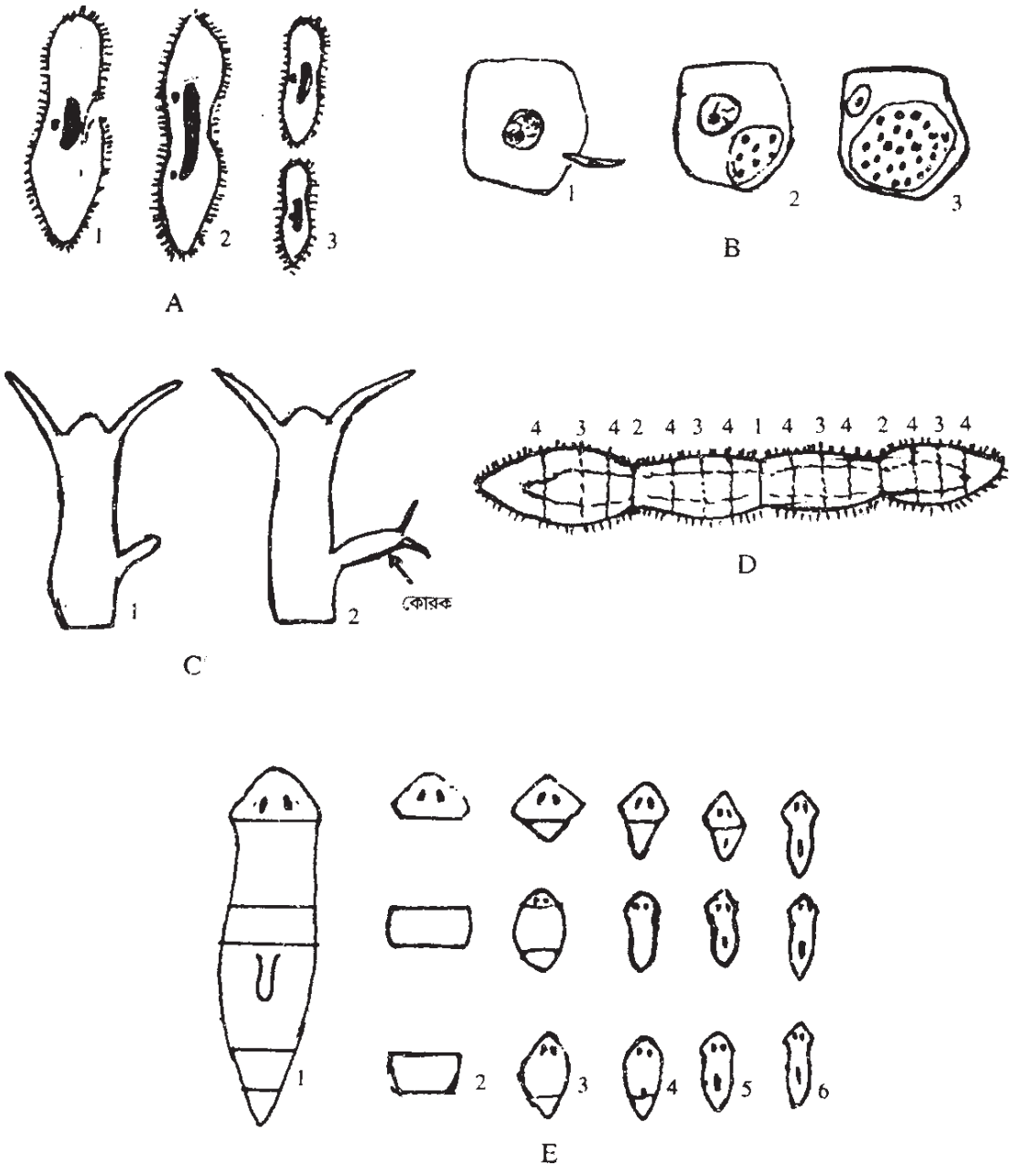

চিত্র নং 2.4 ঃ অযৌন জনন (ক্রমসংখ্যা বিভিন্ন ধাপ বোঝাচ্ছে) A দ্বি বিভাজন, প্যারামেসিয়াম; B- বহুবিভাজন, যকৃত কোষের মধ্যে ম্যালেরিয়া পরজীবী, C-কোরকোদগম, হাইড্রা, D-খণ্ডীভবন- চ্যাপ্টা ক্রিমি, E-পুনরুৎপাদন- প্লানেরিয়া।

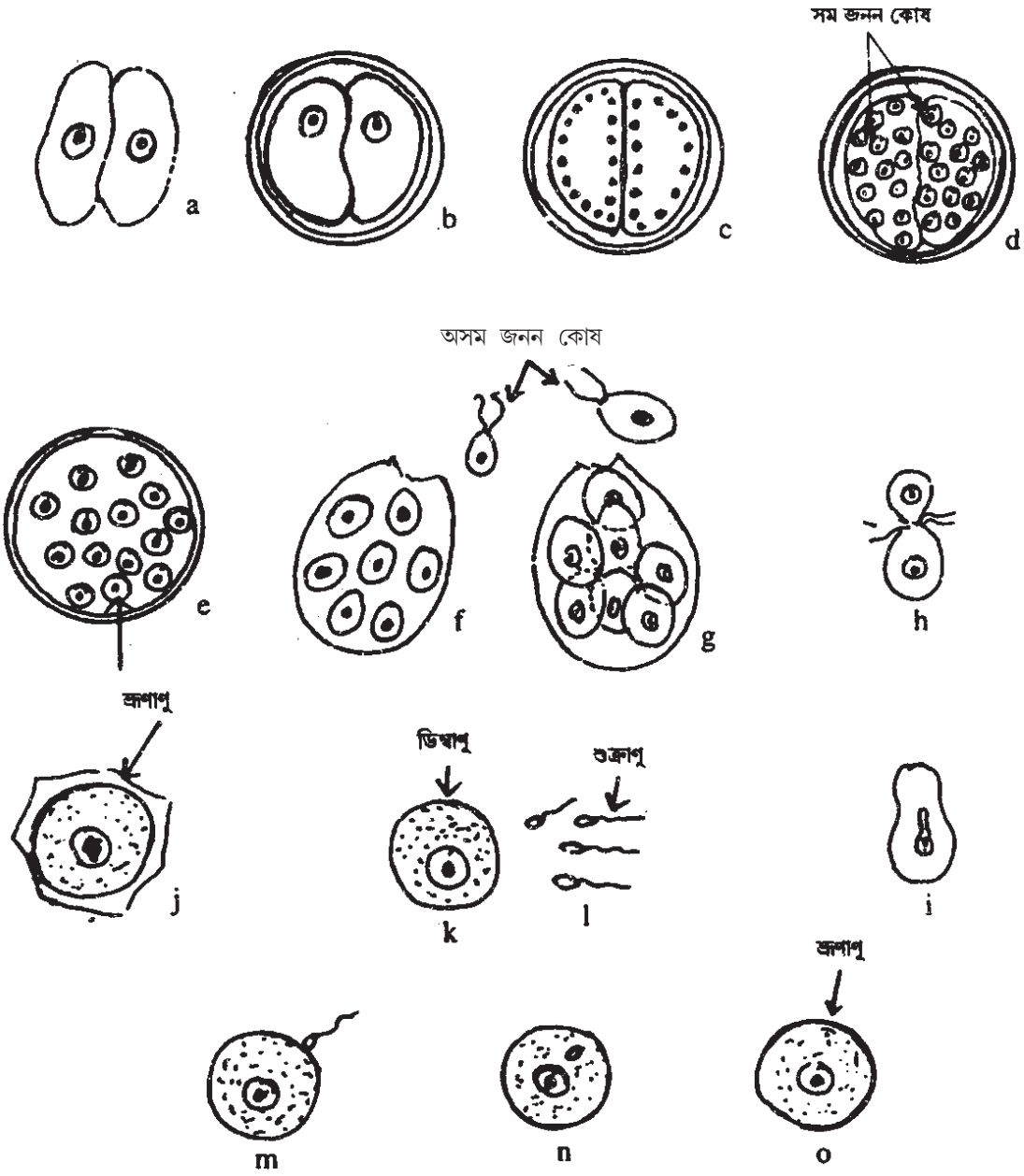

চিত্র নং 2.5 ঃ যৌন জনন। a - e মনোসিসটিসের সমজনন; f-j অসম জনন-ক্লামাইডোমোনাস; k - o বিষম জনন-উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী।

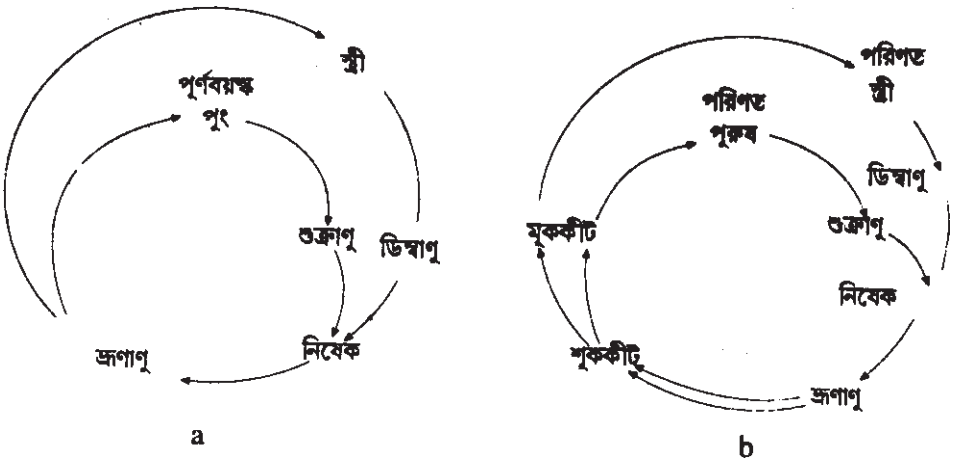

চিত্র নং 2.6 ঃ জীবন চক্রের দুটি প্রকার। a- সরাসরি পরিস্ফুটন; b- শূককীট-মুককীটের মধ্যদিয়ে ঘুরপথে পরিস্ফুটন।